গীতিকবি শ্রীমধুসূদন

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন

গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রণীত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৯

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এম. এ. ; এল্. এল্. বি, ; পি-এইচ ডি. ; এম. এল্. সি.

মহোদয় অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু

নিবেদন

কিছুদিন যাবৎ মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য লইয়া নানা দৃষ্টিকোণ হইতে নূতন নূতন আলোচনা প্রকাশিত হইতেছে। 'মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা'য় তাঁহার নূতন জীবন-ভাষ্য আলোচিত হইয়াছে। এ যাবৎ উপেক্ষিত মধুসূদনের ইংরেজিতে লিখিত পত্রাবলীর উপর নির্ভর করিয়া মধুসূদনের কবি-মানসেরও বিশ্লেষণ হইয়াছে। একজন লেখক মধুসূদনের সর্বজনগ্রাহ্য সমালোচকদের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে এ যাবৎ মধুসূদনের সাহিত্যের যত ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই বিভ্রান্তিকর। কারণ, তাঁহার মতে মধুসূদনের সাহিত্য লইয়া এ যাবৎ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যশস্বী এবং বিদগ্ধ সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদন যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের নিকট ঋণী তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশেরই, মধুসূদন যাহা ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান নাই। তাঁহারা দান্তে, ভার্জিল, মিলটন্‌কেই দেখিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকে দেখেন নাই। সেইজন্য মাইকেল বিষয়ে তাঁহাদের সমালোচনা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃত অবস্থা তাঁহারা বর্ণনা করিতে পারে নাই।

এই অভিযোগ পুরাপুরি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, মধুসূদনের উপর কেবলমাত্র একমুখী প্রভাব পড়ে নাই, অর্থাৎ তিনি ইউরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সম্পর্কে যে অধিকারই লাভ করুন না কেন, প্রাচ্য ভাষায় রচিত কাব্যসমূহকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। বাল্মীকিকে তিনি সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণ হোমার, দান্তে, ভার্জিল, মিলটনের যত সংবাদ রাখেন, বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের তত সংবাদ রাখেন না। সে কথা আমি আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের

ভূমিকাতেও উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধুসূদনের শক্তি বাল্মীকি-কৃত্তিবাস হইতে যতখানি আসিয়াছে, হোমার মিলটন্ হইতে ততখানি আসে নাই। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্য-সমালোচকদিগের মধ্যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাস সম্পর্কে জ্ঞান নিতান্ত অপ্রচুর বলিয়াই মধুসূদনের যথার্থ মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হইতে পারে নাই। সুতরাং এই কর্মে ভবিষ্যতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যদি এই বিষয়ক প্রচলিত এবং গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্র হইতে তথ্য সন্ধানে উদ্যোগী হন, তাহা হইলে মধুসূদনের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হইতে পারে।

মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণও সহজসাধ্য নহে; কারণ, ইহা নানা কারণে অত্যন্ত জটিল। মধুসূদনের সংবেদনশীল কবি-মানসে তাঁহার জীবনের বাহিরের বিচিত্র ঘটনারাশির প্রভাব নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। শৈশবের পারিবারিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্যের শিক্ষাজীবন, তারপর যৌবনের দাম্পত্য জীবন, কিংবা আরও পরবর্তী প্রৌঢ় বয়সের কর্মজীবন কোনও জীবনই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া যাপন করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য একটি সুস্থির এবং স্বাভাবিক মানসিকতাও তাঁহার গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার সাহিত্যে তাঁহার জীবনের একটি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায় না, তাঁহার প্রতিভা আতস বাজীর মত এক মুহূর্তেই আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল, ইহার অপরিস্ফুট অবস্থাটি আমরা দেখি নাই। সুতরাং কেবলমাত্র ইহার পরিণত রূপটি দেখিয়া ইহার বিষয়ে নির্ভুল কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন হইবে। ভবিষ্যতের সমালোচকগণ এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন।

'গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন' নূতন সংস্করণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার মাইকেল মধুসূদন দত্তের গীতিকাব্যমূলক তিনখানি রচনা যেমন, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থশেষে আনুপূর্বিক মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ইহার এই বিষয়ক আলোচনাগুলি মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা সহজ হইবে।

বর্তমান সংস্করণে নূতন কোনও বিষয় যোগ করা কিংবা পূর্ববর্তী সংস্করণের কোন বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। সুতরাং মূল গ্রন্থের সামান্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র।

'গীতি-কবি শ্রীমধুসূদনে'র ভিতর দিয়া মধুসূদন সম্পর্কে নূতন একটি কথা আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার উপর সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। পাঠকগণ হয়ত অবহিত আছেন যে, আমার প্রতিশ্রুত 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন' এবং 'নাট্যকার শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থ দুইটি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যাপারে আমার প্রাক্তন ছাত্র অধুনা অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী এম. এ শব্দসূচীটি রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই আমার আশীর্বাদভাজন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রণীত

মধুসূদন সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থ :

মহাকবি শ্রীমধুসূদন

নাট্যকার শ্রীমধুসূদন

*　　*　　*

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বাংলার লোকসাহিত্য [৬ষ্ঠ] প্রবাদ

" " [৩য়]

'নীল-দর্পণ' ॥ দীনবন্ধু মিত্র

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ব্রজাঙ্গনা কাব্য [১৮৬১]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বীরাঙ্গনা কাব্য [১৮৬২]

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্দশপদী কবিতাবলী [১৮৬৬]

পরিশিষ্ট : মূল গ্রন্থ

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ,
তৃষ্ণাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র-মনে—
পিপাসা নাশের আশে ; এ' দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !
মা'র কোল সম, মাগো, এ তিন ভুবনে—
আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, হায়, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মুছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,—
মধুমাখা কথা ক'য়ে, স্নেহের কৌশলে ?
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে '

: 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'

গীতি-কবি শ্রীমধুসূদন

ভূমিকা

১

ঊনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক গীতিকবিতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বহু আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইলেও এই কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহা প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যেরই যুগ ছিল—আখ্যায়িকা-কাব্যের যুগ ছিল না। তাহা সত্ত্বেও ইহাতে যে বহু সংখ্যক আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলা গদ্য সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, অথচ বিগত কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার যে একটি শক্তিশালী ধারা এই দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংস্কার তখনও এই দেশের সমাজ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; সুতরাং নূতন বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া ইহা পূর্ববর্তী সংস্কারেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা-কাব্যকে যদি এই কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য, জীবনী-কাব্য, ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, প্রণয়-বৃত্তান্তমূলক কাব্য এবং আধুনিক রোমান্টিক কাব্য, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের প্রত্যেকটিরই বহিরঙ্গগত পরিচয় মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্য ধারার প্রাণ-শক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই যুগে আখ্যানমূলক বিষয় প্রকাশ করিবার আর অন্য কোন অবলম্বন ছিল না, সেইজন্য এই বিষয়ক পূর্ব পরিচিত পথই অনুসরণ করা হইতে লাগিল। বিশেষতঃ ঊনবিংশ

শতাব্দীতে বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে নিজের সম্পর্কেও সচেতন হইতে শিখিল, তখন সে তাহার অতীত জীবনের রস-সংস্কার-গুলিকেও নূতন করিয়া পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পাইল; কিন্তু এই প্রয়াস কেবল মাত্র বহির্মুখী ছিল, সামগ্রিক ভাবে জাতির অন্তরের ভিতর হইতে ইহার প্রেরণা সেদিন যদি আসিত, তবে তাহা এত ক্ষণস্থায়ী ও শক্তিহীন হইতে পারিত না। কারণ, দেখিতে পাওয়া গেল, গদ্য-সাহিত্য ও গীতি-কবিতার ক্রমবিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। সুতরাং সাময়িক প্রয়োজনে, সুস্পষ্ট কোন আদর্শের অভাবে জাতির প্রাচীন রস-সংস্কারের একটি ক্ষীয়মাণ ধারা অনুসরণ করিয়া যাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অচিরেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইল এবং যাহা সে দিন জাতির যথার্থ আন্তরিক প্রেরণায় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই কালোত্তীর্ণ হইয়া আসিল—তাহাই গীতিকাব্য। এক কথায় বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত গীতি-কবিতার যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতির রস-চেতনায় গীতিকাব্যের যে চিরদিনই একটি বিশেষ স্থান আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়া আখ্যায়িকা-কাব্যের ধারা ও গীতিকাব্যের ধারা দুইই অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বাঙ্গালীর রস-চেতনায় গীতি-কবিতার শক্তি অধিকতর বলিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তনের পূর্বেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে আখ্যায়িকা-কাব্যের প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং গীতি-কবিতা দ্বারা সহজেই সেই শূন্যতা পূর্ণ হইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতির সম্মুখে উচ্চ কোন আদর্শ ছিল না, সেইজন্য তাহার রস-চিত্তে গীতি-কবিতার ভাবের প্লাবন আসিলেও, তাহা শক্তিশালী কোন আদর্শকে আশ্রয় করিতে পারিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে জাতির মন হইতে সেই অভাব দূর হইয়া গেল। উচ্চতর আদর্শকে অবলম্বন করিবার সেদিন যে সুযোগ দেখা দিল, তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া জাতি গীতিকাব্যের রাজ্যে বিচিত্র সৌধ রচনা করিল।

কেবলমাত্র যতদিন পর্যন্ত সেই আদর্শ ইহার নিজস্ব পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিল না, ততদিন পর্যন্তই পূর্ববর্তী পর্যুষিত রীতির প্রাণহীন অনুকরণ চলিয়াছিল মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ধারা অনুসরণ করিলেন না, তিনি খণ্ড গীতি-কবিতা রচয়িতা রূপেই নিজের কবিত্বের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথাপি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গীতি-কবিতার প্রাণ তাঁহার মধ্যে যে খুব সুস্পষ্টভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় না। ইহার কারণ, প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুগের প্রভাব তিনি অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সংস্কার-মুক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। এই যাবৎকাল বাংলা গীতি-কবিতা যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যেই তাহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা দিল। পূর্ববর্তী যুগের আখ্যান-কাব্যগুলির মধ্য দিয়া যে দৃষ্টি সামগ্রিক সামাজিক ভিত্তির উপর প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার মধ্যে তাহাই ইহাদের সামগ্রিক এবং চিরাচরিত পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বকীয় অনুভূতির আলোকে তিনি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহাই আধুনিক গীতিকাব্যের লক্ষণ। তবে এই কথাও সত্য, ঈশ্বর গুপ্ত বস্তুর উপর একটু বেশি গুরুত্ব দিয়াছেন, তাহার ফলে নিজস্ব অনুভূতিকে ততখানি সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জীবনের সাধারণ উপকরণের প্রতি তাঁহার যে মমতা দেখা যায়, সেই পরিমাণে আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় না। তথাপি তাঁহার পূর্ববর্তী কালে উনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতায় যে সকল বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে তাহাদেরও কিছু কিছু বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার প্রেম-বিষয়ক, দেশাত্ম-বোধক, নিসর্গ-মূলক এবং ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতাবলী যদিও পরবর্তী গীতি-কবিতার ধারায় অখণ্ড যোগসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই, তথাপি আধুনিক গীতি-কবিতার বিষয়-চেতনার দিক দিয়া যে তিনি নূতন

যুগের সার্থক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিক দিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের যে পটভূমিকা রচিত হইয়াছিল, তাহাও আনুপূর্বিক গীতি-কবিতার সুরে বাঁধা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের সময় হইতেই ইহার ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। সেই যুগের আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গীতিরসসিক্ত হইবার ফলে ইহাদের কাহিনীগত দৃঢ়-বদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া যায়—ধীরে ধীরে তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কবিওয়ালাদের রচিত সহস্র সহস্র গানে মধ্যযুগের বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতা ও সংযমের ধারা পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার স্থলে সকল ধর্মচেতনা নিরপেক্ষ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে যে একটি প্রবল নৈতিক আদর্শ এবং ভক্তিবোধ বৈষ্ণব মহাজন গীতিকাগুলির মধ্যে একটি সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা কবিওয়ালাদের গানে দূর হইয়া গেল। চিরাচরিত বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-মন ব্যক্তি সচেতন হইতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রেম-বিষয়ক গীতি-কবিতার বীজ বপন করা সম্ভব হইল। মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই একই অবস্থার সম্মুখীন হইল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দরের মত আখ্যানমূলক কাব্য রচনা করিলেও, তাঁহার মনও যে গীতি-কবিতার সুরে আগাগোড়াই বাঁধা ছিল, তাহাও তাঁহার 'শাক্ত পদাবলী' দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল'ও যুগের এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না—ইহাও আগাগোড়াই গীতি-কবিতার সুরে বাঁধা। প্রথমতঃ ইহার মধ্যে কাহিনী একটি নহে, তিনটি—ইহাদের মধ্যে পরস্পর কোনও সম্পর্কও নাই। অতএব আখ্যান-কাব্যের প্রধানতম গুণ যে কাহিনীর সংহতি, ইহার মধ্যে তাহারই অভাব রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার মধ্যে যে তিনটি কাহিনী আছে, তাহাদেরও প্রত্যেকটি নিজের মধ্যেই এমন শিথিল-বদ্ধ

৩

'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' গীতিকবিতার সুর

মধুসূদন নাটক রচনার ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, তাহার রূপায়ণে তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। তাহারই ফলে আনুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচিত হইল। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এই যে, মধুসূদনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার যে প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহাই 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনার মুখ্য প্রেরণা—মহাকাব্য রচনার প্রেরণা এখানে মুখ্য ছিল না। অর্থাৎ মহাকাব্য রচনার কোন প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি 'তিলোত্তলা-সম্ভব কাব্য' রচনা করেন নাই। বরং অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে তাঁহার মনে যে একটি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহাকেই বাহিরে রূপ দিবার জন্য 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনার সঙ্গে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ইতিহাস যত মুখ্যভাবে জড়িত, ইহার মহাকাব্যের প্রেরণা তত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহে। এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য তাঁহার 'জীবন-চরিত' হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতে পারি। যখন মধুসূদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা তাহারই একাংশ।

'মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন,—"যতদিন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই।" মহারাজা শুনিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ প্রবণতা, তাহাতে যে ইহাতে, কোনদিন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।" মধুসূদন বলিলেন, "আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদের ভাষাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে।" মহারাজা বলিলেন, "বাঙ্গালা

ভাষার গঠন বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদিগের ভাষা হইতে অধিকতর উন্নত, কিন্তু আমি যতদুর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।" মধুসূদন বলিলেন, "সত্য, কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" মধুসূদনের এবং মহারাজার মধ্যে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর মধুসূদন বলিলেন, "আমাদের ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রছন্দে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?" অপর কেহ সে অবস্থায় এরূপ কথা বলিলে হয়ত উপহাস্যাস্পদ হইতেন; কিন্তু মধুসূদনের শক্তি সম্বন্ধে তখন আর কাহারও অবিশ্বাস ছিল না। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি তাহা হইলে পরাজয় স্বীকার করিব এবং আপনার অমিত্রছন্দ রচিত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় প্রদান করিব।" মধুসূদন যে "পদ্মাবতী" নাটকে" অমিত্রছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উপরি উক্ত ঘটনাই তাহার মূল। আদ্যোপান্ত অমিত্রছন্দে একখানি নাটক রচনার জন্য মধুসূদনের তখনই বাসনা জন্মিয়াছিল; কিন্তু সেরূপ আমূল পরিবর্তন করিলে তাঁহার গ্রন্থ সাধারণের আদরণীয় হইবে না ভাবিয়া তিনি "পদ্মাবতী"র কলিদেবের অংশ মাত্র অমিত্রছন্দে রচনা করিয়াছিলেন।...... কিয়দ্দিনের মধ্যেই তিনি, 'তিলোত্তমা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন, তখন কাহারও আর সন্দেহের কারণ রহিল না (যোগীন্দ্রনাথ বসু, ৫ম সং, পৃঃ ২৫৭—২৬০)'। অল্পদিনের মধ্যেই কাব্যের অবিশিষ্টাংশ রচিত হইল এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ব্যয়ে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

মধুসূদন 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকেই

উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং উৎসর্গ পত্রেও এইভাবে ইহার একমাত্র ছন্দের কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন, মহাকাব্যের কোন প্রেরণা কিংবা দাবীর কথা উল্লেখ করেন নাই। উৎসর্গ পত্রে তিনি বলিয়াছেন, 'যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এ'রূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্য উপস্থিত হইবেক, যখন এ'দেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ' কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনায় বাংলা-ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া পরীক্ষা (experiment)-ই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহার মহাকাব্যের প্রেরণা কেবল মাত্র যে গৌণ, তাহাই নহে—একেবারে অনুপস্থিত বলিলেও খুব বেশি কিছু বলা হয় না। অতএব তখন বাংলা সাহিত্যে যেমন মহাকাব্য রচনার যুগও ছিল না, তেমনই ইহা রচনার মধ্যে মহাকাব্য রচনার মৌলিক প্রেরণাও কার্যকরী হইতে পারে নাই, 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' এবং মধুসূদনের কবি-প্রতিভা বিচার করিবার কালে এই বিষয়টি গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' একটি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করা হইলেও ইহার আদ্যোপান্ত পৌরাণিক মর্যাদা রক্ষা পায় নাই—স্থানে স্থানে কবির রোমান্টিক চেতনা ইহার পৌরাণিক কাহিনীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার রচনায় কবির আত্ম-নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পায় নাই, তিনি অনেক উপকরণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য বিশেষতঃ মিল্‌টনের *Paradise Lost* হইতে গ্রহণ করিলেও নিজের স্বকপোল-কল্পিত কাহিনীও ইহার মধ্যে যোগ করিয়াছেন। ইহার কাহিনী যেমন মহাকাব্যের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তেমনই শিথিল-

বদ্ধ; চিত্রধর্মিতাই ইহার বৈশিষ্ট্য; চিত্রগুলি কাহিনীর অনিবার্য ক্রম-বিকাশের সূত্রে বিধৃত নহে বলিয়াই ইহাদের দ্বারা একটি অখণ্ড রস সৃষ্টি হইতে পারে নাই, খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়াই গীতি-কবিতার বহিরঙ্গ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নিসর্গ কিংবা অন্যান্য বহির্মুখী বর্ণনার মধ্য দিয়া মহাকাব্যের গুণ (epic quality) অপেক্ষা গীতি-কবিতারই গুণ বিকাশ লাভ করিয়া কবির সাধনায় আসন্ন গীতি-কবিতা রচনার যুগের পূর্বাভাস সূচনা করিয়াছে। ইহার মধ্যে কবি ক্লাসিকাল উপমার পরিবর্তে যে সকল রোমান্টিক উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যেমন,

একাকিনী বিরহিণী বিষণ্ণ-বদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
… … …
দুহিতা যেমতি
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে।
… … …
সতীত্ব-বিহনে যথা যুবতী যৌবন।
… … …
যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-দুহিতা
গৌরী,…

ইহাদের মধ্যে ক্লাসিক উপমার স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি কিংবা বিশালতার ইঙ্গিত নাই, ইহাদের গীতিকবিতাসুলভ ব্যঞ্জনাই মুখ্য।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র বহুস্থানেই মধুসূদনের আসন্ন গীতি-কবিতা 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' রচনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন,

'গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জ পানে যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।'

এই রসচেতনা উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার জননী হইলেও, মহাকাব্যের ভাব-গম্ভীর বস্তু-পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায়।

মিল্‌টনের *Paradise Lost* কিংবা কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করিয়া 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র যে সকল অংশ রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া মধুসূদনের নিজস্ব রচনা ও ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে প্রায় সর্বত্রই এই শ্রেণীর চেতনা কার্যকরী হইতে দেখা যায়। অথচ 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র কাহিনীর মধ্যে যে ইহার প্রচুর অবকাশ ছিল, তাহা নহে। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' রচনা কাল পর্যন্ত মধুসূদনের জীবনে প্রাচ্য সাহিত্য-সংস্কারের প্রভাব সম্পূর্ণ বিসর্জিত হইতে পারে নাই, তাঁহার সর্ববিষয়ক সংস্কার মুক্তি তাঁহার এই কাব্য রচনার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই; কারণ, এই কাব্যের মধ্য দিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দকে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, এই কাব্যের ছন্দ গঠনেই তিনি এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভব করিবার জন্য ইহার বিষয়-বস্তুর মধ্যে আর কোনদিক দিয়া তিনি নূতনত্বের সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। সেইজন্যই ইহা প্রধানতঃ তাঁহার প্রাচ্য প্রভাবিত যুগের রচনা বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ তদানীন্তন সুধী-সমাজের স্বীকৃতি লাভের পর তিনি তাঁহার পরবর্তী রচনা, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়াই চিন্তা ও কর্মের সকল প্রকার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সেইজন্য তাহার মধ্যেই মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার যথাযথ বিকাশ দেখা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'কে মহাকাব্যরূপে সৃষ্টি করা মধুসূদনের সংকল্প থাকিলেও, তাহা মহাকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি-সমালোচক মোহিতলাল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর কবির পক্ষে, বিশেষত বাঙ্গালী কবির পক্ষে, মহাকাব্যের প্রেরণা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মহাকাব্যের কবির পক্ষে যে শান্ত, সংযত রসাবেশ—দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও সংশয় হীন চিত্ত-স্ফূর্তির প্রয়োজন, তাহাই মধুসূদনের সজ্ঞান

কামনা হইলেও, তিনি তাঁহার ব্যক্তি-চেতনার অন্তস্তলে তাহা অনুভব করেন নাই ['শ্রীমধুসূদন' পৃঃ ২৪-২৫]।' বীররস মহাকাব্যের প্রাণ-স্বরূপ; একটি সমগ্র জাতির গৌরবময় কর্ম ও বহির্মুখী আচরণ অবলম্বন করিয়াই বীররসের স্বাভাবিক বিকাশ হইবার সুযোগ হয়। কবির ব্যক্তিগত মনোভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া একটি বীর্যবান্ জাতির শক্তিমত্তার উল্লাস মহাকাব্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন হয়। মধুসূদন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বীররসাত্মক কাব্যরূপে সৃষ্টি করিবেন; কিন্তু একদিক দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যেও যেমন বীররসের চেতনার অভাব ছিল, তেমনই তাঁহার নিজের মধ্যেও তাঁহার স্বকীয় জীবনের ব্যক্তিগত-অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় ছিল না। সেইজন্য তিনি বীররস সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইলেন এবং আদ্যোপান্ত করুণ রসের মধ্য দিয়াই তাঁহার কাব্যের উপসংহার করিলেন। নিজের জীবনের দৈব-লাঞ্ছনার পথ অনুসরণ করিয়াই তাঁহার কাব্যে যে করুণ রসের অবাধ অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দিক দিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁহার নিজের জীবনেরই ব্যর্থতার কাহিনী—রামায়ণের কাহিনী এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। সেইজন্যই তাঁহার এই কাব্যে 'এপিক আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে।' একটি দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পঞ্চম সর্গ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, ইন্দ্রের আদেশে মহামায়া লঙ্কায় লক্ষ্মণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জননীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়াছেন, বহুদিন জননীর সান্নিধ্যবঞ্চিত লক্ষ্মণ সহসা স্বপ্নে জননীকে দেখিতে পাইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, তারপর যে মুহূর্তে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সেই মুহূর্তেই,

'চমকি উঠিয়া বলী চাহিল চৌদিকে।
হায় রে, নয়ন জলে ভিজিল অমনি।

বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র,—"দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পুজি পা'-দুখানি,
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ" ?'

এই কথা যে কেবল মাত্র লক্ষ্মণেরই, তাহা ত নহে! ইহার সঙ্গে মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়িত হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রটির ভিতর দিয়া মধুসূদনের নিজের জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মর্মান্তিক পরিচয়টি কিছুতেই গোপন থাকিতে পারে নাই।; কারণ, ইহার মধ্যে কঠিন কর্তব্যারূঢ় ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের সুদৃঢ় জীবন-প্রত্যয় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে বাঙ্গালী সন্তানের সঙ্গে তাহার জননীর চিরন্তন স্নেহ-সম্পর্কের সুনিবিড় কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের নিজেরই জীবন-কথা কেবলমাত্র লক্ষ্মণের রূপকের ভিতর দিয়া এখানে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এইখানেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' গীতিকবিতার একটি গুণের বিকাশ দেখা যায়। জীবনের সঙ্গে তাঁহার এই কাব্যের এত নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল যে, মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনার ভিতর দিয়া নিজের অবচেতন আত্মা হইতে যেন কবির নিজের জীবনের শোচনীয় মৃত্যুর এই নির্মম ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল,

'প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!'

লক্ষ্মণ চরিত্রের দৃঢ়তা যেমন মধুসূদনের এই শ্রেণীর গীতি-কবিতা সুলভ মনোভাবের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, রাম চরিত্রও তাহাই হইয়াছে; বাঙ্গালীর জাতীয় চৈতন্যসুলভ ভ্রাতৃ-বাৎসল্যবোধ রাম চরিত্রেরও একটি সুদৃঢ় অবলম্বন হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রমীলার চিতারোহরণের বর্ণনা যে গতানুগতিক সহমরণ বর্ণনার একটি প্রাণহীন চিত্রই নহে, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইহা তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার একটি সহৃদয় বর্ণনা। এই প্রকার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। সুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয়টি সর্গে সম্পূর্ণ একটি মাত্র কাব্য হইলেও, ইহা সর্গে সর্গে এমন কি সর্গ মধ্যেও খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার সুরে বাঁধা— আনুপূর্বিক ইহার কাহিনীর প্রবাহ সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন নহে। স্থানে স্থানে ইহার মধ্যে যে করুণ রসের অনুভূতি নিতান্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কবির নিজ জীবনেরই ব্যর্থ হাহাকার। কাব্যের নায়ক রাবণের চরিত্র তাঁহারই নিজের জীবনের দৈববিড়ম্বনার সকরুণ চিত্র। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকার সঙ্গেও ইহার যোগ অবিচ্ছেদ্য। সেইজন্য ইহা মধুসূদনের একান্ত আত্মকথা হওয়া সত্ত্বেও, ইহা সেই যুগের জাতির কাব্য হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

মহাকাব্য রচনার মধ্য দিয়া যেমন একটি সুস্থ, সহজ এবং স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তি আবশ্যক, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ভাঙা গড়ার যুগের একটি সমাজ ইহার অবলম্বন হইয়াছিল; সেই সমাজে সন্দেহ, আশঙ্কা, আত্মপ্রত্যয় সকলই ছিল, একটিমাত্র সহজ অবস্থার ভিতর দিয়া সে সমাজের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। ইহার মধ্যে যে বিক্ষোভ, জটিলতা, এবং অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়া তাহারই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে এবং এই পরিচয়ের ভিতর দিয়া কবির জীবনও নানাভাবে মুক্ত হইয়াছে। এই সূত্রেই 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' লিরিক-প্রবৃত্তির প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং যে কাব্যকে মধুসূদন সচেতনভাবে মহাকাব্য হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া কল্পনা
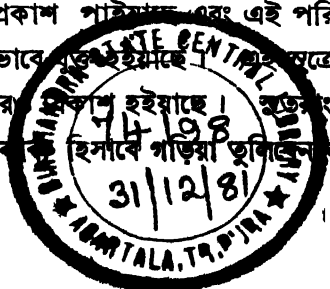
করিয়াছিলেন, তাহা একদিক দিয়া যুগের প্রভাব, আর এক দিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যথার্থ মহাকাব্যরূপে পরিচিত করিতে পারেন নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আকাগরত লক্ষণ মহাকাব্যের ভ্রমোৎপাদন করিলেও তাঁহার পরবর্তী কাব্যগুলি সম্বন্ধে এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কোনও অবলম্বন নাই—তাহাদের মধ্যে গীতিকবি মধুসূদনের পরিচয়টি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার একই সঙ্গে যে তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও রচনা করিয়াছেন, এই বিষয়টির সুগভীর তাৎপর্যের কথা আমরা বিস্তৃত হইয়া, তাঁহার প্রতিভার ইহা একটি বিস্ময়কর দিক ভাবিয়াই তাঁহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হইয়া থাকি; কিন্তু এই বিষয়টির ভিতর দিয়া এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়াছে যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে বহিরঙ্গগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে যাহাই থাকুক না কেন, অন্তরাত্মার দিক দিয়া ইহারা অভিন্ন। কেবলমাত্র সেইজন্যই ইহারা উভয়েই এক সঙ্গেই রচিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয় নাই। এমন কি 'বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব, তখনও দেখিতে পাইব যে, তাহার মধ্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ধ্বনি এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সুর অনুরণিত হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেকটিই একটি অখণ্ড গীতি-কবিতার সুরে আবদ্ধ। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণের বিলাপ ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা-বিরহ 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নারী চরিত্রগুলির অন্তর্বেদনার রূপ লাভ করিয়াছে। গীতি-কবিতার এক অখণ্ড সুর 'আত্মবিলাপ' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে উৎসারিত হইয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' অতিক্রম করিয়া মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পর্যন্ত গিয়া স্পর্শ করিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে শেষ জীবনেই মধুসূদনের গীতিকবিরূপে প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেও 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতেই ইহার যাত্রা সুরু হইয়াছিল।

৪

মধুসূদন ও তাঁহার পূর্ববর্তিগণ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যেমন কোন আকস্মিক ঘটনা নহে, তেমনই রবীন্দ্র-কাব্য জাতির সাহিত্যসাধনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্য কীর্তি নহে। এই কথা যাঁহারা মনে করেন না, তাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যেরও যেমন যথার্থ মর্যাদা দেন না, বাঙ্গালীরও রস-সৃষ্টির মৌলিক ধারার সঙ্গেও কোন পরিচয় প্রকাশ করেন না। বাঙ্গালীর সুদীর্ঘ সাহিত্য-সাধনার পরিণত ফলরূপেই বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। রবীন্দ্র-সাধনার ভিত্তিমূলে বাঙ্গালীর জাতীয় রস-সংস্কারের প্রেরণা যতখানি শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ নবযুগের নূতন কাব্যসাহিত্যের প্রেরণাও ততখানিই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। যে সাহিত্যসৃষ্টি জাতির জীবনের মর্মমূল পর্যন্ত প্রবেশ করিবার শক্তি লাভ করে, তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিবার শক্তিও জাতির অন্তর হইতে নিতান্ত স্বাভাবিক সূত্রেই আসিয়া থাকে; এই দিক দিয়াই কবি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া জাতির চিত্ত জয় করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার আবির্ভূত হইবার এবং তাঁহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার এই উভয় শক্তিই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মধ্যেই সমাহৃত ছিল। এই বিষয়টুকু বুঝিতে পারিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি আমাদের বিমূঢ় ভাব যতখানি কাটিয়া যাইতে পারে, বাঙ্গালী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ততই বাড়িতে পারে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই আধুনিক যুগের রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কালের কয়েকজন গীতিকবি সম্পর্কে আমাদের একটু সুস্পষ্ট ধারণা রাখার প্রয়োজন আছে।

আগেই বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক যুগের প্রথম গীতিকবি। তাঁহার প্রতিভার মধ্যে আধুনিক গীতি-কবিতা রচনার যে মৌলিক প্রেরণা ছিল, তাহা নহে—তিনি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাব-বিলাসিতার পরিবর্তে

স্থূল বস্তুবাদী ছিলেন, তবে জীবনের স্থূল উপকরণকেও তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুভব করিতে পারিতেন এবং তাহাদের ভিতর দিয়া তাঁহার একটি রস-চেতনা সার্থক হইয়া প্রকাশিত হইত। গীতি-কবিতার চেতনার সঙ্গে যে সূত্রে কবিগণ নিজেদের জীবনকেও গাঁথিয়া থাকেন, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সেই চেতনা ছিল না ; তাঁহার গীতি-কবিতা প্রধানতঃ বহির্জগতের বস্তু জীবনাশ্রিত—রসোজ্জ্বলতার গুণেই তাহা কবিতা, সীমায়িত অনুভূতির গুণে তাহা গীতি-কবিতার স্বধর্মী। গীতি-কবিতার মধ্যে যেমন কবির একান্ত অন্তরের পরিচয়টি ধরা দেয়, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না ; তিনি সকলের চোখ দিয়াই নিজেকে দেখিয়া থাকেন, নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি গীতি-কবিতাধর্মী এবং ইহার শিরোনামা 'আত্ম-বিলাপ' হইলেও ইহা তাঁহার একান্ত অন্তরের ব্যক্তিগত বেদনার অভিব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ; ইহা যতটুকু সকলের ততটুকুই তাঁহার নিজের, ইহার বেশি আর কিছু তাঁহার দাবী নাই। এই কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

না বুঝিলে সার মর্ম হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আমার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কাযরে॥
ইন্দ্রিয় যাহার বশ ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযুস-রস সুখে সেই খায় রে॥

কিন্তু মধুসূদনের 'আত্ম-বিলাপ' ভাবের গভীরতায় এবং রসের নিবিড়তায় ইহা হইতে স্বতন্ত্র ; তাহার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিজীবনের যে মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শক্তি রহিয়াছে, অর্থাৎ সেখানে কবি ও তাহার সৃষ্টি যে একাকার হইয়া আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন,

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় !

* * *

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

* * *

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল তলে
ফেলিস, পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায়রে ভুলিবি কত আশার কুহকছলে ?

ব্যক্তিগত জীবনের যে নৈরাশ্য ঈশ্বর গুপ্তকে তাঁহার 'আত্ম-বিলাপ' রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, মধুসূদনের জীবনের নৈরাশ্যের বেদনা যে তাহা হইতে গভীর, তাহা ইঁহাদের জীবনী পাঠ না করিলেও এই কবিতা দুইটির ভিতর দিয়াও বুঝিতে পারা যাইবে। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন সকলের সঙ্গে নিজের কথা বলিয়াছেন, মধুসূদন তেমনই নিজের হইয়াই নিজের কথা বলিয়াছেন, অথচ তাহাতে সকলের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়াছে —ইহাই উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার লক্ষণ ; ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতা রচনার অগ্রদূত হইলেও, গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট গুণ

তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই, পরবর্তী কবি মধুসূদনের মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাহারই সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ দেখা যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত যে বস্তু বা বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিতেন, তাহার দিকে বাহির হইতে চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিতেন, তাহা তাঁহার নিজের অন্তরের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিতেন না—ইহা জ্ঞানের দৃষ্টি, ভাবুকের দৃষ্টি নহে; কিন্তু মধুসূদন বক্তব্য বিষয় কিংবা ভাবকে নিজের জীবনের ভিতর হইতে অনুভব করিতেন, নিজের জীবনের অতিরিক্ত কিংবা তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে দেখিতেন না। 'স্বদেশ' নামক কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের ভাব এবং বিষয় উভয়ই বহির্মুখী, যেমন,

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কতকাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥

এমন কি, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যে অংশে দেশাত্মবোধের ভাব প্রকাশ পাইয়া ইহাকে গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গেও ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্ধৃত কবিতার এই বিষয়ে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই, যেমন,

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।

কিন্তু মধুসূদনের এই বিষয়ক গীতি-কবিতার বিষয় কেবল মাত্র এই প্রকার বাহিরের দেখা জিনিষ নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব জীবন সূত্রে গ্রথিত, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-চেতনার অভিব্যক্তি, অথচ তাহা সত্ত্বেও ইহা সর্বজনীন। তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি এই সম্পর্কে স্মরণ করা যাইতে পারে ; যেমন,

রেখ, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে !
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে,
এ' দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চির-স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে,
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন ;
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা, আমি, কহ গো শ্যামা-জন্মদে ?

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে স্ববরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শারদে।

ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলালের কবিতার একটি বিশেষত্ব এই যে, গীতি-কবিতা সুলভ একটি মাত্র ভাবাশ্রিত হইলেও, সামগ্রিক ভাবে তাঁহাদের কবিতা এক একটি অখণ্ড পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই—যে কোন অংশ হইতে ইহা আরম্ভ করিয়া যে কোন অংশ পর্যন্ত আসিয়া তাহা শেষ করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু মধুসূদনের কবিতাটি আদ্যোপান্ত একটি অখণ্ড ভাব ও রস-সূত্রে বিধৃত, ইহার কোন আংশিক পরিচয় নাই ; ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের রচনা বহির্মুখী, কিন্তু মধুসূদনের রচনা একান্ত অন্তর্মুখী, এই গুণেই ইহাতে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের মধ্যে এই বিশিষ্ট গুণটির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা কবিতার জনক হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদনই ইহার প্রাণদাতা—ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল ইহার বহিরঙ্গে একটি অপরিণত গঠন দিয়াছেন, মধুসূদন তাহাতে প্রাণ দিয়াছেন, সেই প্রাণের স্পর্শ লাভ করিয়াই ইহা তাঁহার সময় হইতেই একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিযা যাইতে সক্ষম হইয়াছিল ; তিনি ইহার মধ্যে এই প্রাণ-সঞ্চার করিতে না পারিলে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের পথ ধরিয়া ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিত না।

সুতরাং দেখা যায়, কালানুক্রমিক বিচার করিলে মধুসূদন অন্ততঃ দুইজন আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা রচয়িতার পরবর্তী হইলেও শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার যে লক্ষণ, তাহা বাংলা সাহিত্যে তাঁহার মধ্যেই প্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র বহিরঙ্গের গুণে কবিতা গীতি-কবিতা হয় না, মধুসূদনের পূর্ববর্তিগণ কেবলমাত্র সেই বহিরঙ্গেরই স্রষ্টা,

কিন্তু মধুসূদন গীতি-কবিতার অন্তরাত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন। অন্তরাত্মার পরিচয়েই গীতি-কবিতার পরিচয়, মধুসূদনের কাব্যে সেই পরিচয়ই সার্থক হইয়াছে।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী হইতেই আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার সূচনা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। এই বিষয়ে মধুসূদন যে কেবল মাত্র বিহারীলালের পূর্ববর্তী, তাহা নহে—মধুসূদনের মধ্যে গীতি-কবিতার এমন কতকগুলি গুণের বিকাশ হইয়াছে, যাহা বিহারীলালের মধ্যে একান্ত অভাব রহিয়াছে। কবিতায় কবির আত্মানুভূতির প্রকাশ যদি গীতি-কবিতার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ হইয়া থাকে, তবে সে ভাব মধুসূদন যত সংযত ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বিহারীলাল তাহা পারেন নাই। মধুসূদনের গীতি-কবিতা সুসংহত ভাব-কেন্দ্রিক হইয়াও রসপুষ্ট। বিহারীলালের ভাব অসংযত, রচনা সুরপ্রধান; মধুসূদনের গীতি-কবিতায় বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতা নাই, কিংবা আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তিতে বলিষ্ঠতার অভাব নাই। স্বপ্নজগৎ বিহারীলালের গীতি-কবিতার উৎস, কিন্তু মধুসূদন বাস্তব জীবন ও জগৎকে স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছেন; বিশেষতঃ গীতি-কাব্যদেহের তিনি যে একটি সুপরিণত গঠন দিয়াছেন, তাহা বিহারীলাল অপেক্ষা সকল বিষয়েই সার্থক হইয়াছে। এই গুণে মধুসূদনই আধুনিক গীতি-কবিতার প্রাণ-দাতা—মধুসূদনের গীতি-কবিতায় যে প্রাণ-শক্তি ছিল, বিহারী-লালের তাহা ছিল না।

৫

মধুসূদনের পরবর্তী মহাকাব্য

এই কথা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয়-বস্তুর তুলনায় হেমচন্দ্র রচিত 'বৃত্র-সংহার কাব্য' এবং নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যত্রয়ী ('কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস') কিংবা 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিষয়-বস্তু মহাকাব্যের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। রূপায়ণের মধ্য দিয়া যে ত্রুটিই প্রকাশ পা'ক না কেন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের যথাযথ বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন, মধুসূদন তাহা পান নাই। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মধুসূদন প্রবর্তিত মহাকাব্য-রচনার ধারা অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি অর্থে এই কথা বলিতে চাহেন, তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব করা প্রয়োজন। হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের মধ্যে মধুসূদন রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রেরণা নাই, মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন-সচেতনতা যেমন তাঁহার কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের সম্পর্কে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র কেহই সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণ পর্যন্ত করিতে পারেন নাই—কারণ, যে ধ্বনিজ্ঞান ও রস-বোধ দ্বারা মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সার্থক করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের মধ্যে তাহাদের অভাব ছিল। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, মধুসূদন আনুপূর্বিক তাঁহার প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই উভয় কাব্য রচনা করিলেও হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র আনুপূর্বিক তাঁহাদের কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা না করিয়া মধ্যে মধ্যে মিত্রাক্ষর যুক্ত প্রচলিত পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদনের যে বিশ্বাস ছিল, ইহার প্রতি হেমচন্দ্র কিংবা

নবীনচন্দ্রের সেই বিশ্বাস ছিল না। মধুসূদনকে অনুকরণ করিতে গিয়া হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ছন্দের দিক দিয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যেমন অমিত্রাক্ষর হয় নাই, তেমনই মধুসূদনের জীবনবোধ ও রস-চেতনাও তাঁহাদের ছিল না বলিয়া তাঁহাদের রচিত কাব্যও যাহা হইয়াছে, তাহা মধুসূদনের রচনা হইতে স্বতন্ত্র। তাহা হইলে হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের মনে মহাকাব্য রচনার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহা কি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আসিয়াছিল? কিন্তু তাহাও স্বীকার করা যায় না। মধুসূদন রচিত 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ও বিশেষতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বহিরঙ্গগত প্রভাবের বশবর্তী হইয়াই যে হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, মধুসূদনের কাব্য বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে এক অখণ্ড পরিচয়-সূত্রে আবদ্ধ; একথাও সত্য যে অন্তরঙ্গ বা অন্তরগত প্রেরণার অভাব থাকিলে বহিরঙ্গের অনুকরণও সার্থক হইতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র মধুসূদনের কাব্যরচনার বাহিরের পরিচয়টুকু লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যে কাব্য রচনা করিলেন, তাহা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রাণশক্তির ত অধিকারী হইতে পারিলই না, উপরন্তু বাহিরের পরিচয়কেও সার্থক করিয়া তুলিতে পারিল না। সুতরাং দেখা গেল, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মধুসূদনের কাব্য-সাধনার উত্তর-সাধক নহেন, তাঁহারা মধুসূদনের প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজেদের সাধনার মধ্য দিয়া তাহার গূঢ়শক্তি যে কোথায় নিহিত ছিল, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের মধ্যে নিজের জীবনকে আনিয়া যে ভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহা মধুসূদনেরই একান্ত নিজস্ব গূঢ় উপলব্ধির বিষয় ছিল, সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, সেইজন্য হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার বহিরঙ্গের রূপ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তথাপি ইহার বহির্মুখী যে রূপ

অন্তরের ধ্যানলোক হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার কেবলমাত্র বহিরঙ্গের শক্তি এবং তাৎপর্যও যথার্থ বোধগম্য হইবার কথা নহে। সেইজন্য তাহা অনুকরণ করিয়া 'বৃত্র-সংহার' এবং 'কুরুক্ষেত্র'ই রচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হয় নাই।

হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনার যে বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা স্বাধীনভাবেই পাইয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রে মধুসূদনের নিকট তাঁহাদের ঋণ নিতান্ত গৌণ। 'বৃত্র-সংহারে'র মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের আত্মকথা কিছুমাত্র নাই, ইহা নৈর্ব্যক্তিক—এই বিষয়ে ইহা মহাকাব্য রচনার আদর্শ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যে যুগের প্রভাব মধুসূদনও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই, হেমচন্দ্রও তাহা পারেন নাই। মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও দৈর্ঘ্যের কথা বাদ দিলেও তাঁহার কাব্য রচনার দিক দিয়া অনেক স্থলেই গীতিসুরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কারণ, এ কথা সত্য, হেমচন্দ্রের প্রতিভাও প্রধানতঃ যুগোচিত গীতিকাব্য রচনার প্রতিভা। যদিও মহাকাব্য রচনার প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার আত্ম-ভাবপরায়ণতা (subjective mood)-কে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে বহু সংখ্যক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তি-সচেতন রোমান্টিক মনোভাবের অভিব্যক্তি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তিনিও ধর্মতঃ গীতিকবিই এবং গীতি-কবিতার মধ্যেই যেমন সর্বকালীন বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতম কবি-শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেই যুগেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহারে'র মধ্যে তাঁহার মহাকাব্য রচনার প্রয়াস যতদূরই সার্থকতা লাভ করুক, তিনি তাঁহার গীতিকবিতাগুলি রচনার দিক দিয়াই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রতিভারও স্বাভাবিক বিকাশ তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কিংবা 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র গীতি-কবিতাগুলির ভিতর দিয়া যতখানি সম্ভব হইয়াছে, তাঁহার কাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়া তত সম্ভব হয় নাই। অথচ 'পলাশীর যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিচেতনার স্পর্শে যেমন রোমান্টিক পরিচয় লাভ করিয়াছে, তেমনই তাঁহার গীতি-কবিতাগুলিও যুগোচিত

রোমান্টিক চেতনায় সমুজ্জ্বল। অতএব ছন্দের দিক দিয়াই হউক, কিংবা বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়াই হউক, মধুসূদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কেহই অনুসরণ করিতে পারেন নাই; কেবলমাত্র বাহিরের বিষয়গুলির অনুকরণ করিতে গিয়া প্রত্যেকেই নিজেদের পথের সন্ধান পাইয়াছেন—তারপর সেই পথেই তাঁহারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, আর কেহই পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকান নাই। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের উপর মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যে প্রভাবের কথা যে কেহ যে ভাবেই বলুন না কেন, ইঁহাদের কাহারও উপর তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রভাবের কথা এই পর্যন্ত কেহই বলিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যে অসংখ্য গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কোন অংশেই মধুসূদন রচিত উল্লিখিত গীতিকাব্যগুলির কোনই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। অথচ গীতি-কবিতা রচনায়ও যে মধুসূদন সে যুগে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য। এমন কি, এমন কথাও একজন সমালোচক অনুমান করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার গীতি-কবিতা রচনার জন্য মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র নিকট এক হিসাবে ঋণী। যদিও এই কথা কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নহে, তথাপি এই কথাটি সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে যে মধু-সূদনের উত্তরসাধক বলিয়া অনেক সময় নির্দেশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহারা কোন্ অর্থে উত্তর-সাধক? যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া মধুসূদন পরিচিত, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র কেহই তাহা অনুকরণ করিতে পারেন নাই, অধিকাংশ মিত্রাক্ষর ছন্দেই তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন; ভাষা ও বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়া ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় তাহাতে একের সার্থকতা ও অন্যের ব্যর্থতার পরিচয় প্রকাশ প্রায়; অনুভূতির দিক দিয়াও সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে—মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার যে মৌলিক শক্তি তাঁহার গীতিকাব্য রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে তাহারও প্রভাব একেবারেই নাই; সুতরাং মধুসূদনের ক্ষেত্রে যথার্থ কোন উত্তর-সাধক নাই।

মাইকেল মধুসূদন ও শ্রীমধুসূদন

মধুসূদনের জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকষ্টের মূল এই পরধর্ম গ্রহণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, 'যাঁহারা প্রতিভার অভিমানে ধর্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং নিজের সুখ স্বার্থের জন্য পিতা, মাতা, সমাজ সকলের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যেন মধুসূদনের পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ করেন।' যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহাদের নিকট মধুসূদন তাঁহার ইংরেজী নাম মাইকেল বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সমালোচক সাম্প্রতিক কালে তাঁহার নাম হইতে মাইকেল কথাটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের মতে তিনি শ্রীমধুসূদন, মাইকেল মধুসূদন নহে। এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য-মূলক, সেইজন্য এখানে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

খৃষ্টান ধর্মের মৌলিক নীতির প্রতি আকর্ষণ বশতঃ মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ' পর্যন্ত তাহা কেহই বলেন নাই। একটি উচ্চতর সমাজ-জীবনের প্রলোভনই তাঁহাকে এদিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই সকলের অভিমত। সেইজন্য খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করিবার পর ইহার আচার আচরণের প্রতি তাঁহার যে কোন সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নহে। এই বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার মধ্যে পার্থক্য ছিল। মধুসূদন তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—Christianity is a civilising agency. I would fight like a crusader if any one would speak aginst it, but my real feeling is Hindu. তাঁহার সমগ্র জীবনে খৃষ্টান ধর্মের আচার সম্পর্কে সুকঠিন আনুগত্যের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দায়িত্ব লইয়া

কলিকাতার খৃষ্টান সমাজে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং এই সকল বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাহিরের দিক দিয়া তাঁহার জীবনের একটি পরিচয় ছিল—তাহাতে তিনি খৃষ্টান, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তাঁহার আর একটি পরিচয় ছিল, যেখানে তিনি হিন্দু। সুতরাং একদিক দিয়া যেমন তিনি মাইকেল মধুসূদন, তেমনই আর একদিক দিয়া তাঁহাকে শ্রীমধুসূদনও বলা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষের বাহিরের পরিচয় যাহাই থাকুক না কেন, তাহাও জীবনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে, তাহা জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই—কোন কোন সময় অন্তর্লোকের উপরও তাহার সুগভীর প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায়। মধুসূদনের জীবন ও সাধনার মধ্য হইতে তাহার এই মাইকেলের পরিচয় কতদূর পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এক হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায়, 'মাইকেল' ও 'শ্রী' এই উভয়ের দ্বন্দ্বেই মধুসূদনের জীবন ও সাধনা রূপ লাভ করিয়াছে, একটিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া আর একটির সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সুতরাং তিনি যেমন মাইকেল মধুসূদন বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না, তেমনই কেবলমাত্র শ্রীমধুসূদন বলিলেও তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। বিষয়টি একটু আলোচনা সাপেক্ষ।

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে মধুসূদন যে বিশপ্‌স্ কলেজে পড়িবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এই বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কারণ, হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের এবং বিশপ্‌স্ কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য ও জীবনাদর্শ এক ছিল না। বিশপ্‌স্ কলেজে পাঠ করিবার ফলে মধুসূদন ইউরোপীয় বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য পাঠ করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হিন্দু কলেজে থাকিলে পাইতেন না। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সে'দিন একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছাত্রগণ কলেজে আসিয়া যাহাই অধ্যয়ন করুক না কেন, গৃহে তাঁহাদের একটি জাতীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইত। সেইজন্য তাহাদের জীবনে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা হইতে যে

প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া লইবার সুযোগ ছিল; সুতরাং সেখানে খৃষ্টান ধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্মের চিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছিল; এমন কি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত আনুপূর্বিক ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাবান চরিত্রের বিকাশও সম্ভব ছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা ছিল, ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য-বিধানের শিক্ষা। সেইজন্য এই প্রতিষ্ঠান সেই যুগের জাতির একটি সুগভীর দায়িত্ব পালন করিয়াছে। কিন্তু বিশপ্‌স্‌ কলেজের জীবন ও শিক্ষা ছিল স্বতন্ত্র। ইহা ছিল খৃষ্টান ছাত্রদিগের আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইহার শিক্ষা এবং জীবন-ধারার মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইত না। বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়নকালীন মধুসূদন অবস্থা বিপাকে পড়িয়া এই দেশীয় সকল ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষার একাগ্র সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে যে সহজাত কাব্যসাধনার ধারাটির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা ব্যাহত হইল। সমাজ ও পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বৈদেশিক একটি সমাজ ও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি নিজেও এই দেশ ও সমাজের সকল প্রকার সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে বয়সে তিনি বিশপ্‌স্‌ কলেজ ও তাহার সমাজ-জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই বয়সের শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের প্রভাব জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ ও বিশপ্‌স্‌ কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হয়; কলেজ জীবন শেষ হইবার পরও মাদ্রাজ প্রবাস-জীবন পর্যন্ত তাহা অগ্রসর হইয়া যায়। এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া শিক্ষা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে স্তরে স্তরে যে বস্তু ও ভাবের প্রেরণা তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছিলেন, তাহাই তাঁহার পরিণত জীবনে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুনরায় আত্ম-প্রকাশের দিন তাঁহার সাধনার ভিত্তিরূপে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

এই সুদীর্ঘ কালের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ মুছিয়া দিয়া সেদিন যে বাংলা সাহিত্যাকাশে শ্রীমধুসূদন রূপেই তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই কথা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। কারণ, মধুসূদন সেই প্রকৃতির কবিই নহেন। রোমান্টিক চেতনাই প্রধানতঃ তাঁহার কাব্য সৃষ্টিকে যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার যৌবনের ধ্যান-ধারণার প্রভাব তাঁহার প্রৌঢ় জীবনের কীর্তির মধ্যেও সক্রিয় হইয়া থাকিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক।

বিশপ্‌স্ কলেজে ভাষাশিক্ষার যে ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, হিন্দু কলেজে তাহা ছিল না। বিশপ্‌স্ কলেজের ব্যাপক ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই মধুসূদনের সঙ্গে হোমারের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে এবং হোমারের মত মহাকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার তিনি স্বপ্ন দেখেন। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়া প্রথম জীবনের তাঁহার সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইল, তারপর যখন তিনি বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইলেন, তখন কি তিনি তাঁহার যৌবনের সেই স্বপ্ন বিসর্জন দিয়াছিলেন? তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে যে 'দুই তৃতীয়াংশ গ্রীক্' বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রেরণা কি সেখান হইতেই আসে নাই? 'গৌড়জনে'র 'নিরবধি সুধাপান' করিবার জন্য তিনি যে মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, বিশপ্‌স্ কলেজের শিক্ষার ভিতর দিয়া যদি দেশ দেশান্তরের বিচিত্র ভাষায় তাঁহার অধিকার না জন্মিত, তবে তাহা কি ভাবে সম্ভব হইত? সুতরাং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ, বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন এবং মাদ্রাজ প্রবাস-জীবনকে বাদ দিয়া মধুসূদনকে যাঁহারা কেবলমাত্র 'শ্রী' যুক্ত করিয়াই পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কেবলমাত্র জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধের অহমিকায় মধুসূদনের প্রতিভার মৌলিক ভিত্তিটির কথা বিস্মৃত হইতে চাহেন। মধুসূদন তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া যে খৃষ্টান ধর্ম ও সমাজের সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহার স্মৃতিফলকে খোদিত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত শোক-গাথা (epitaph)টি হইতেও বঝিতে পারা যায়। সমাধি কিংবা শ্মশানের

উপর শোক-গাথা রচনা হিন্দু কিংবা ভারতীয় সংস্কার নহে। হিন্দুর বিশ্বাস শ্মশানের অঙ্গারে মানুষের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখে না; সেইজন্য চিতার শেষ চিহ্নটুকুও তাহারা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়; তাহার কোন অবশেষ থাকিতে দেয় না। জীবন নিত্য, জীবন জন্ম-জন্মান্তরাশ্রয়ী, কিন্তু স্মৃতিফলকে শোক-গাথা রচনার ভিতর দিয়া এই সংস্কারের পরিচয় প্রকাশ পায় না, ইহা মধুসূদনের বিজাতীয় ধর্ম ও শিক্ষারই ফল। যে ভাষাতেই এই শোক-গাথা রচনা করিয়া তিনি যেভাবেই ইহাতে নিজের নাম লিখুন না কেন, ইহার উদ্দেশ্যটির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, খৃষ্টান ধর্মপ্রেরণার মধ্য হইতেই তাহা আসিয়াছে, হিন্দুধর্মের সংস্কার হইতে তাহা আসে নাই। ইহার সম্পর্কে এতখানি গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইহা তাঁহার অন্তিম কালের রচনা; যখন মানুষ অকপটে নিজের অন্তরকে অনাবৃত করিয়া দিতে পারে, সংসারের লাভ ক্ষতির মিথ্যা প্রলোভন তাহার অন্তরকে সত্যভ্রষ্ট করিতে পারে না, সেই সময়ই মধুসূদন ইহা রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহার ভিতর দিয়া এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান ধর্মোপাসনার সঙ্গে তাঁহার যে সম্পর্কই থাকুক, অন্তরের দিক দিয়া তাহার প্রভাব তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সক্রিয় ছিল। এই কথা নিঃসন্দেহে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মধুসূদন রচিত এই শোক-গাথা

দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ-কাল এ' সমাধি-স্থলে,
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম, মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।

ইহা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত 'চিরন্তন' কবিতার ভাবটি হিন্দু-সংস্কারের অধিকতর অনুগামী, যেমন—

যখন পড়্‌বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,

চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে,
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে॥

...   .

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করব খেলা সেই আমি।
নতুন নামে ডাক্‌বে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিবদিনের সেই আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে,
তারাব পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্‌লে॥

সুতরাং খৃষ্টান ধর্ম ও শিক্ষার প্রভাব চিন্তায় ও কর্মে মধুসূদন যে জীবনের কোন মুহূর্তেই সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া বাঙ্গালী হিন্দু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করা কঠিন। সুতরাং মাইকেল পরিচয়টিও তাঁহার নামের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই পরিচয়ই যদি তাঁহার সব পরিচয় হইত, তাহা হইলে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগরণের যুগের আদি কবি হইতে পারিতেন না; যেখানে তিনি কবি, সেখানে তিনি সে যুগের বাঙ্গালী হিন্দু—এই হিন্দুত্বের শক্তিও তাঁহার খৃষ্টান জীবনাচরণ অপেক্ষা কম প্রভাবশালী ছিল না। এইখানেই তাঁহার সঙ্গে সে যুগের অন্যান্য ধর্মান্তরিত হিন্দুদিগের পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এইখানে তাঁহার পার্থক্য ছিল। রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মের অসারতা উপলব্ধি করিয়া খৃষ্টান ধর্মের

শক্তিতে আন্তরিক বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন এবং নিজে যে কেবল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—যে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, আজীবন তাহার প্রচার কার্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার খৃষ্টধর্মবোধের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব কিংবা বিরোধ ছিল না—তাঁহার জীবনাচরণে ও ধ্যান-ধারণায় কোনও প্রকার পার্থক্য ছিল না; সেইজন্য ধর্মান্তরিত হইয়াও তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক জীবনই যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; তিনি খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস লইয়াই যে মূলতঃ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার জীবনী যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার কতকগুলি বহির্মুখী কারণ ছিল; প্রথমতঃ তিনি পিতার প্রস্তাবিত অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে ইহাই সহজ উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ এক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী পরিবারের এক আধুনিকা কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং এই উপায়েই সেই কার্য সহজ সিদ্ধ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার বিলাত যাইবার যে উচ্চাভিলাষ ছিল, তাহাও এই উপায়েই সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি ইহার বহুদূর পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই এই কার্যে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদনের উপর তাঁহার পিতৃচরিত্রের কোন প্রভাব ছিল না। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। সেই অনুসারেই তাঁহাদের পুত্রদিগেরও চরিত্র গঠিত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের একটি অশিথিল বন্ধন মধুসূদনের উপর ছিল না বলিয়াই তিনি সহজেই সেই অপরিণত যৌবনেই নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহার অন্তরের কোন যোগ ছিল না। অন্তরের মধ্যে তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী হিন্দু-সত্তা সজাগ ছিল। বিশপ্‌স্ কলেজের

শিক্ষা, মাদ্রাজ-প্রবাস ও ইংরেজি-সাহিত্যের অনুশীলনের ভিতর দিয়া তাহার প্রভাব তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অনুভব করিতে পারিলেন না সত্য এবং সেইসূত্রে এক বিজাতীয় জীবনাচরণ তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেও তাঁহার প্রচ্ছন্ন বাঙ্গালী হিন্দু-সত্তা তাঁহাকে মৌলিক প্রতিভা-বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের দিকে অনবরত আকর্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—তাহাতেই তাঁহার বাংলা সাহিত্যের সাধনা সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু যেদিন তিনি তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের যথার্থ ক্ষেত্রটির সন্ধান পাইয়া নিজের বাঙ্গালী হিন্দু-সত্তাটিকে তাঁহাব ভিতরে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে দিন কি তিনি চিন্তায় ও কর্মে তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনের সংস্কারকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াছিলেন? তাহা নহে, তাহা সম্ভবও নহে—জীবনাচরণে ত বটেই, চিন্তায় ও কর্মে যে তখনও তাহার প্রভাব তিনি অনুভব করিতেন, তাঁহার ব্যাবিস্টার জীবনের ইতিহাস তাহাব প্রমাণ। জীবনে ইহাই তাঁহার দ্বন্দ্ব ছিল এবং এই দ্বন্দ্ব হইতে জীবনে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্কৃতি পান নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের মধ্যে যেমন স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনই সাহিত্যের মধ্যেও ভাবগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা মাইকেল মধুসূদন ও শ্রীমধুসূদনের দ্বন্দ্ব। সুতরাং তাঁহাকে কেবল মাত্র যদি শ্রীমধুসূদন বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে এই দ্বন্দ্বের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরিচয় প্রকাশ পায় না। তবে এই কথা সত্য, তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়া ভাব ও আদর্শগত যে দ্বন্দ্বেরই পরিচয় দিন না কেন, যখন তাঁহার গীতিকবিতাগুলি বিচার করি, তখন দেখিতে পাই যে, সেখানে তিনি তাঁহার এই দ্বন্দ্ব অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়া শ্রীমধুসূদনেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন; কারণ, সেখানে তাঁহার কবি-প্রাণতার পরিচয় যতখানি স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, অন্যত্র তাহা হয় নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ই আদর্শ; 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও মধ্যে মধ্যে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও এই ভাবের একেবারে অভাব নাই।

প্রথম অধ্যায়

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'
(১৮৬১)

১

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বৈষ্ণব পদাবলী

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তখন আর বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে বাংলা সাহিত্যে কিংবা বাঙ্গালীর সমাজে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না; যাহা ছিল, তাহা কবিওয়ালাদের গান ও দাশুরায়ের পাঁচালী। অন্তরে বাহিরে ইহারা বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও পরিচয়ই বহন করিতে পারে নাই, নূতন সমাজমন হইতে ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছিল। মধ্যযুগের যে সমাজ-মানস হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসার হইয়াছিল, তাহা তখন অতীত অন্ধকারের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই বিষয়ে মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর একটু পার্থক্য ছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও মঙ্গলকাব্য কোন না কোন ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আসিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচেতনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং ইহার ধর্মবোধের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারই রসাভিব্যক্তি পদাবলীর মধ্যেও আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালে এ'দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিত হইলেও, বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয় নাই; ইহার কারণ, ইহার সম্মুখে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুস্পষ্ট আদর্শটি

তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; তারপর চৈতন্যধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর যখন ইহার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ সমাজের সম্মুখে স্থাপিত হইল, তখনই বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ জন্ম ও বিকাশ সম্ভব হইল। চৈতন্যদেবের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব তাঁহার প্রকট কালেই বাংলা দেশের উপর হইতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি সমাজের উপর চৈতন্যধর্মের আদর্শের প্রভাব যতদিন সক্রিয় ছিল, ততদিন পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীও ইহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রভাব অধিককাল এই সমাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তখন হইতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার আদর্শও শিথিল হইতে লাগিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ইহার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। একান্তভাবে বিশেষ একটি ধর্মচেতনা ও ভক্তি-বিশ্বাস ইহার অবলম্বন ছিল বলিয়া, ইহার ক্রমবিকাশের ধারা সেই ধর্মবিশ্বাসেরই ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য ইহার উভয়েরই বিনাশ এক সঙ্গেই সম্ভব হইল, এককে বাদ দিয়া অপর বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস স্বতন্ত্র; ইহা কোনদিনও সমাজের কোনও অন্ধ ধর্মবোধকে নিজের অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এক সুবিস্তৃত উদার জীবন ইহার অবলম্বন হইয়াছিল—সেই জীবন সকল প্রকার সংস্কারের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিল বলিয়া ইহার অগ্রগতির ধারায় এমন কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ প্রবর্তিত মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মধ্যযুগে উভয়েরই বিকাশ হইলেও মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী যেমন একই লগ্নে জন্মগ্রহণ করে নাই, তেমনই একই লগ্নে ইহাদের বিনাশও সম্ভব হয় নাই। বাস্তব জীবনাশ্রয়ী বলিয়া মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি ছিল, ভাবাশ্রিত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে তাহা ছিল না। তথাপি মঙ্গলকাব্যের যুগেরও যে অবসান হইয়াছিল, এই কথা সত্য; তবে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছিল—

সে'কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। এখানে কেবলমাত্র আমাদের বক্তব্য এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর কোন সংস্কারই আর অবশিষ্ট ছিল না; সমাজ-জীবনের চিন্তা ও আচরণে তখন যে নূতন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে মধ্যযুগের যে সমাজ-মানস হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পূর্ণ অনুরূপ কোনও রস-বস্তু সেই যুগে আত্মপ্রকাশ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য ভাববিলাসী বুদ্ধিজীবী যে নাগরিক সমাজ আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণের পরিচয় প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার মধ্যে তখন পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-চেতনার পুনরুত্থানের কোনও আভাস দেখা যায় নাই। মধুসূদনের সমসাময়িক কালেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ও সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার প্রভাব সমাজ-চেতনার মধ্যে সুদূর-প্রসারী হয় নাই। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে পুনর্জাগ্রত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ কলিকাতার নাগরিক সমাজের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরমহংসদেবের বাণী, গিরিশচন্দ্রের নাটক, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং সর্বশেষে মাধ্ব গৌড়ীয়-মঠের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভিতর দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যত দূরই অগ্রসর হউক, মধ্যযুগের সেই ভক্তি ও বিশ্বাসাশ্রিত সমাজটি ইহাদের ভিতর দিয়া আর ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। এই পুনরুত্থানের ভিতর দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণসত্তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই, মঠ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আচারগুলির পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর পুনর্জন্ম লাভ করিবার অবস্থা ছিল না—কারণ, ইহা বুদ্ধিজীবী সমাজের চিন্তার বিলাস মাত্র ছিল, জীবন-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল না। তবে এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের বাণী তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচারের ফলে নাগরিক সমাজের মধ্যেও একটি বৈষ্ণবভাব প্রচার লাভ করিয়াছিল, ইহার সঙ্গে জাতীয় রস ও অধ্যাত্মচিন্তার একটি সুদূর সংযোগ ছিল বলিয়া তাহারও প্রভাব সে যুগের সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে যিনি অগ্রণী তিনিই মধুসূদন এবং এমন কি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ এ'দেশের সমাজে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্বেই তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে তাঁহার এই কাব্য হইতেই সেদিন এ'দেশের নাগরিক সমাজে বৈষ্ণব ভাবের পুনঃপ্রচার হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সম্মত শুদ্ধা ভক্তিভাবের পুনঃ প্রচারের জন্য যদি কাহারও গৌরব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবেরই প্রাপ্য। তারপর মধুসূদনের রচনাটি সম্মুখে পাইয়া তাহা পরমহংসদেবের শিষ্যগণও নিজেদের কাজে নানাভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

যাঁহাদের রচনা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-চিত্র বাংলাদেশে পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদনই কেবলমাত্র যে সর্বপ্রথম, তাহাই নহে—তিনি সর্বপ্রধানও বটে। আলোচনা করিয়া আমরা দেখিব রামকৃষ্ণ-ধর্মমত প্রচারিত হইবার পর গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকার ও কবিগণ তাঁহাদের রচনায় এই প্রসঙ্গটিকে যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সকলে অন্ততঃ আঙ্গিকের দিক হইতে মধুসূদনকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পূর্ববর্তী কোন আধুনিক কবি—ঈশ্বর গুপ্তই হউন, কিংবা রঙ্গলালই হউন ইঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া কোন রচনাই প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বর গুপ্ত বহু খণ্ড গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, প্রেম-বিষয়কে ভিত্তি করিয়াও তিনি গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর রস-মানসে যে যুগল রূপকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার কবিতার মধ্যে তাহার কোনও প্রভাব অনুভূত হয় না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজপুত জীবন ও উড়িষ্যার প্রাচীন লোক-শ্রুতি অনুসরণ করিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর রস-মানস সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারও দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্তী ছিল। সুতরাং মধুসূদনের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যরচনার প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। জাতীয় পুনর্জাগরণ জাতির রস-চিত্তের মধ্যে যদি নিজের প্রেরণা না পায়, তবে তাহা যেমন একদিক দিয়া জাতীয় পদবাচ্য হইতে পারে না, তেমনই ইহাকে পুনর্জাগরণও বলা যাইতে পারে না। মধুসূদনই উনবিংশ শতাব্দীতে আদর্শভ্রষ্ট বাঙ্গালীর সম্মুখে জাতীয় রসোপকরণকে পুনরুদ্ধার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' অবলম্বন করিয়া একটি বিশিষ্ট রূপে ইহা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া আর একটি বিশিষ্টরূপে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্য বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণের মূলে মধুসূদনের যে দান, তাহার তুল্য তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের মধ্যে আর কাহারও তাহা নাই; এমন কি, পরবর্তীদিগের মধ্যেও এই গুণ সর্বত্র সমান প্রকাশ পায় নাই। অথচ হেমচন্দ্র পুরাণের বহু দুরূহ বিষয়কে তাঁহার কাব্যের অবলম্বন করিয়াছিলেন; নবীনচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অবলম্বন করিলেও বাঙ্গালীর জাতীয় রস-চিত্তের ভাব-বিগ্রহ স্বরূপিণী শ্রীরাধাকে তাঁহার কাব্যের এক প্রান্তেও স্থান দেন নাই। বিহারীলালের রচনায় সুর প্রাধান্য লাভ করিলেও, সে সুরে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর রাগিণী বাজে নাই, তেমনই রাধার চিত্রও রূপায়িত হয় নাই। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ইহার ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজে ব্রাহ্মধর্ম সুলভ একটি নীতি-মূলক (puritan) মনোভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে রাধার চিত্র সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কিন্তু মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া এই মনোভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া জাতীয় রস-চিন্তার ধারার সঙ্গে একটি সহজ যোগ স্থাপন করিলেন, তাহার ফলে জাতির যথার্থ পুনর্জাগরণের প্রয়াস তাঁহার মধ্য দিয়াই সর্বাধিক সার্থক হইল।

২

মধুসূদনের বৈষ্ণব-প্রাণতা

এই কথা সকলেই জানেন যে মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' একসঙ্গেই রচনা করিয়াছিলেন; ইহাতে মধুসূদনের প্রতিভা-সম্পর্কে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, '—"তিলোত্তমা সম্ভব" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" এক সঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বিষয় হয়, তবে "মেঘনাদবধ" ও "ব্রজাঙ্গনা" এক সঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর; একদিকে রণভেরীর দিগন্তভেদী সুগভীর নিনাদ, অপরদিকে মলয়-মারুত-সমানীত সুমধুর বংশীধ্বনি, একদিকে স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর দৃশ্য, অপরদিকে বসন্তকুসুম-সুশোভিত, পিক কুল-নিনাদিত বৃন্দাবনের চারুচিত্র, যুগপৎশ্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয়।' কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অন্তস্তলে গীতিকবিতার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে পারিলে ইহাদের উভয়ের একসঙ্গে রচনা বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করিতে পারে না, যদি ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়, তবে ইহা আদৌ বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, মধুসূদনের প্রতিভা এই স্তরের প্রতিভাই নহে,—তাঁহার কাব্যসৃষ্টি তাঁহার সমগ্র জীবন-চেতনার সূত্রে বিধৃত, তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তাঁহার কাব্যের কোন অংশই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও মধুসূদনের সহজাত প্রতিভার স্বাভাবিক সৃষ্টি, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কেবলমাত্র বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যেই যাঁহাদের দৃষ্টি সীমায়িত, তাঁহারাই কেবলমাত্র 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সঙ্গে ইহার এককালীন রচনা বলিয়া বিস্ময়বোধ করিতে পারেন; কিন্তু ইহার অন্তর্প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা উভয়েই একই কবি-প্রাণ হইতে নিতান্ত স্বাভাবিক সূত্রেই উৎসারিত হইয়াছে। 'ব্রজাঙ্গনা

কাব্যে'র মূল বিষয় বিরহ; এই বিরহের বেদনা যে রাধাকৃষ্ণের দৈবী প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন; সুতরাং ইহা লৌকিক সংসারেরই একটি বেদনা; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র করুণ রসের ভিতর দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে ইহার এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই—ইহাও করুণরসাত্মক 'মহাকাব্য'—বীররসাত্মক নহে। এই করুণ রসও লৌকিক জীবনভিত্তিক; প্রেম এখানে মুখ্য না হইলেও, এখানে প্রেম আছে, বিচ্ছেদ আছে, বিচ্ছেদের সুগভীর বেদনাও আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অশোক বনে বন্দিনী বিরহিণী সীতার সঙ্গে যদি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহিণী রাধিকার তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহা মনে হয় না। এই ঐক্য কেবলমাত্র ভাব ও চিত্রগত নহে—অনেকক্ষেত্রে ভাষাগতও বটে। অশোক বনের এই চিত্রটির সঙ্গে কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবনের চিত্রটির তুলনা হইতে পারে—

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম প'ড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ' দুখ-কাহিনী।

ইহাদের মধ্যে প্রাচীন কাব্য (classic)-সুলভ ব্যাপ্তি ও বিশালতা নাই, কিন্তু বক্তব্য বিষয়কে নিঃশেষে প্রকাশ করিবাব পরিবর্তে গীতি-কবিতাসুলভ ব্যঞ্জনা এবং তাহা দ্বারা পাঠকের মনে এক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা ও অভিনবত্ব বোধ জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা যায়—ইহাই উৎকৃষ্ট রোমাণ্টিক কবিতার লক্ষণ, এই গুণেই ইহা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবন রাধার দৃষ্টিতে এই রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কোন

কোন অংশে যে ক্লাসিক্যাল ব্যপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তাহারও যে প্রভাব একেবারেই নাই, তাহা নহে; এই সম্পর্কে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথন হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

...............খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল নূপুর কাঞ্চী।

ইহার মধ্যে যে ক্লাসিক্যাল ব্যাপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অনুরূপ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও আছে। বিরহিণী শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা সব আভরণ!
ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চিত দেহে ভস্মের লেপন॥

সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভাব, চিত্র ও ভাষাগত অনৈক্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' একসঙ্গে রচিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নিম্নলিখিত অংশটি বৈষ্ণবী ভক্তির কস্তুরী চন্দনে সুরভিত—

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেব-দোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে পুজেন রমেশে!
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুল সখী
উষা যথা! কোথাও বা দধি-দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নিম্নোক্ত চিত্রটিও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধিকার চিত্রেরই অনুরূপ—

স্বপনে শুনিলা শিশু সে মধুর ধ্বনি,
হাসিল মায়ের কোলে মুদিল নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে।

সুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এক সঙ্গে রচিত হইবার মধ্যে বিস্ময়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই। যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর গীতিকবিতার রসধারা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই 'ব্রজাঙ্গনা'য় স্পষ্টতর হইয়াছে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যাহা অন্তঃস্রোতা ছিল, তাহাই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' কূলপ্লাবী হইয়াছে মাত্র।

মধুসূদন আবেগ-প্রবণ বাঙ্গালী জাতিরই সন্তান, সেই সূত্রেই তিনি জীবনের মর্মমূল হইতেই বৈষ্ণব ভাবের প্রেরণা অনুভব করিতেন। তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার যুগ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গেলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তিনি তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' যেমন লিখিয়াছেন,

গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীব ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জ-পানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্ব-মুলে যমুনার কুলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।

তেমনই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও অনুরূপ ভাব ও চিত্র যে কি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও উল্লেখ করিয়াছেন,

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, ঋষিকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপিজনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে
রুক্মিণী,

তেমনই তিনি তাঁহার সুদূর প্রবাস-জীবন ইউরোপে গিয়া জীবনের শেষভাগেও এই চৈতন্যের ধারা যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'দেব-দোল' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জবনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ;
ভেবো না গাইছে পিক কল-কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
দেখ, মেলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে ;—
আসিছেন সবে হেথা এই দোলাসনে—
পুজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

প্রবাস-জীবনের নিজের দুঃসহ বেদনার মধ্যেও তিনি এই 'ব্রজ-বৃত্তান্ত' স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন :

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা, চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব-রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
ব্রজের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?

কোথায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা।

বাংলার বিস্মৃতপ্রায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্মরণ করিয়াও বৈষ্ণব জীবন-চিত্রেরই সহায়তায় তিনি লিখিয়াছিলেন,

আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলে হরষে ;
যমুনা হ'য়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতি, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

এই কবি-চিত্তভূমিতেই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সহজ উৎসার সম্ভব হইয়াছিল, মধুসূদনের এই সহজাত বৈষ্ণব কবিপ্রাণতার মধ্যেই 'ব্রজাঙ্গনা'র জন্ম ও বিকাশ। ইহা তাঁহার কবি-প্রতিভার একটি নিতান্ত স্বাভাবিক দিকেরই পরিচায়ক,—কোনও বিস্ময়কর দিকের ইঙ্গিত নহে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদনের সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার কোনদিক দিয়াই যে বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তাঁহার বৈষ্ণব-প্রাণতা তাহার অন্যতম নিদর্শন। মধ্যযুগ হইতেই বাঙ্গালী কবিমাত্রেরই মনে যে বৈষ্ণব ভাবের বিকাশ অনুভব করা যাইতেছিল, তাহাই ক্রমপরিণতির ধারা অনুসরণ করিয়া মধুসূদন পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মধ্যযুগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কবি হইয়াও বৈষ্ণব-প্রেরণা যেভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, মধুসূদনও ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের কবি হইয়াও তাহা সেই ভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন।

৩

বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'

অনেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র তুলনা করিয়া থাকেন; ইহাদের মধ্যে তুলনার কথাই যে আসিতে পারে না, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে কতকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে, তথাপি স্পষ্টতর করিয়া এই কথাটি প্রকাশ করা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচনার প্রেরণা সক্রিয় থাকিলেও বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রেরণা এ'দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিতা যদি কেবলমাত্র গীতিকবিতাই হইত, তাহার আর কোন সম্প্রদায় কিংবা সমাজগত আশ্রয় কিংবা সম্প্রদায়গত প্রেরণা না থাকিত, তবে তাহা বাঙ্গালীর গীতিকবিতা রচনার নিরবচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা যে পারে নাই, তাহার অর্থই এই যে, উভয় রস-বস্তু এক নহে, সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

অন্তর্মুখী পরিচয়েই যে বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এক নহে, তাহাই নহে—ইহাদের বহির্মুখী পরিচয়ও পরস্পর স্বতন্ত্র, এখানে তাহার কথাই একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত রাধাকৃষ্ণ কাহিনী-ভিত্তিক বিশেষ একশ্রেণীর রচনা বুঝায়, মধ্যযুগে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনা মাত্রই বৈষ্ণব পদাবলী নহে। এমন কি, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'ও বৈষ্ণব পদাবলী নহে। বৈষ্ণব পদাবলীর রচনা ও তাহার আস্বাদন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার সূত্রে অখণ্ড ভাবে বিধৃত বলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় নির্দিষ্ট একটি বিশিষ্ট বহির্মুখী রীতি ইহার রচনা কার্যে আরোপ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের যে সকল বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায় রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনা লইয়া উক্ত সম্প্রদায় নির্দিষ্ট রীতিটি যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনাই বৈষ্ণব পদাবলী বলিয়া গৌরব

লাভ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বৃত্তান্তকে তথায় যথেচ্ছ বর্ণনা করিবার উপায় ছিল না, একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়া তাহা রচিত হইত। বলা বাহুল্য, মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' সেই রীতি অনুসরণ করেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে যথাক্রমে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার পূর্বরাগ, রসোল্লাস, অভিসার, মিলন, ঋতু-উৎসব, রসাবেশ, মুরলীশিক্ষা, দানলীলা, বাসক-সজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান, আপেক্ষানুরাগ, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' কেবলমাত্র 'বিরহ'ই বর্ণিত হইয়াছে, আর কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় নাই ; বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ একটি পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন আকস্মিক প্রসঙ্গ কিছু মাত্র নহে এবং এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক চেতনায় বহির্মুখী বিরহের কোন স্থানই নাই· সুতরাং বিরহেব পূর্বাভাসরূপে তাহাতে যেমন 'আক্ষেপানুরাগ' অংশ বর্ণিত হইতে দেখা যায়, তেমনই ইহার পরিণতিতে 'ভাব-সম্মিলনে'রও বর্ণনা আছে। কিন্তু মধুসূদন রচিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' যেমন আক্ষেপানুরাগ নাই, তেমনই ভাব-সম্মিলনও নাই। সুতরাং তাঁহার রচিত 'বিরহ' লৌকিক বিরহ, যে সূক্ষ্ম ভাব-চেতনায় বৈষ্ণব কবির বিরহের মধ্য দিয়াও একটি অখণ্ড তৃপ্তির সুর বাজিয়া উঠে, মধুসূদনের 'বিরহে' তাহা নাই। বৈষ্ণব কবিতার 'বিরহ' ভাব-সম্মিলনমুখীন, ইহা সমুদ্রের সুগভীর তলদেশাশ্রিত ভাব-চেতনার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; আক্ষেপানুরাগের অন্তর্বেদনার অনুভূতিতে ইহার জন্ম, ভাব-সম্মিলনের পরমা তৃপ্তিতে ইহার মুক্তি ; এই ভাব মধুসূদনের 'বিরহে'র মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবিতার সুগভীর অন্তর অনুভূতিতে তিনি যেমন রিক্ত, তেমনই বহির্মুখী শাসন হইতেও তিনি মুক্ত ; সুতরাং ইহা বৈষ্ণব কবিতা নহে, গীতিকবিতা মাত্র। আমরা জানি বাংলা দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই ; কিন্তু কানু বিষয়ক গীত মাত্রই এই দেশে যেমন বৈষ্ণব কবিতা নহে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও বৈষ্ণব কবিতা নহে। এমন কি, বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'ও বৈষ্ণব মহাজন পদকর্তাদিগের অনুশাসন সৃষ্টি হইবার

পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে তাঁহাদের নির্দিষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী রচনার আদর্শ অনুসরণ করা হয় নাই ; সুতরাং ইহাও বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই, পরবর্তী কোন বৈষ্ণব পদ সংগ্রহেও ইহার পদ ধৃত হয় নাই। এমন কি, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, বৈষ্ণব চরিতকারগণ এই কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও এবং এই চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না, এই কথা সত্য হইলেও বৈষ্ণব পদ সংগ্রাহকগণ তাঁহাদের পদাবলীর সংগ্রহ হইতে ইহার রচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কে যখন আমরা বৈষ্ণব পদাবলীকে টানিয়া আনি, তখন বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কেই আমাদের ধারণা যে কত অস্পষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে আঠারটি গীতিকবিতা আছে, মধুসূদন ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি শিরোনামা দিয়াছেন ; ইহা আধুনিক রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণব কবিতার বৈশিষ্ট্য নহে। বৈষ্ণব কবির রচিত পদগুলি মধুসূদনের এক একটি গীতিকবিতা হইতে আকারে অনেক ক্ষুদ্র। কারণ, ইহাদের পরিচয় বহির্মুখী বিস্তারে নহে, বরং অন্তর্মুখী গভীরতায়। মধুসূদনের কবিতাগুলির অন্তর্মুখী সেই গভীরতা নাই বলিয়া ইহাদের বহিরঙ্গ দীর্ঘতর হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার ক্ষেত্রে জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই কথা সত্য নহে; ভাষা ও অন্যান্য আঙ্গিকের দিক দিয়া ত তাহা করেনই নাই, ভাবের দিক হইতেও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র উপর জয়দেব কিংবা বিদ্যাপতির কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না। যাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি ভারতচন্দ্র ; সে কথা পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষা অর্থাৎ মৈথিলী-বাংলা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করেন নাই। অথচ এই কথা সত্য, ব্রজবুলিই মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ ভাষারূপে গণ্য হইয়াছিল। অথচ ইহাও সত্য যে, কোন কোন বৈষ্ণব কবি ব্রজবুলি ভাষার উপর ততখানি গুরুত্ব আরোপ না করিয়াও পদাবলী

রচনা করিয়াছেন, চৈতন্য পরবর্তী যুগের দ্বিজ চণ্ডীদাস কিংবা জ্ঞানদাসের কথা অনেকেই মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহারাও ব্রজবুলিকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় ব্রজবুলির ভাষার কোন প্রভাব স্বীকার করেন নাই, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার স্বাভাবিক ভাষাতেই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রজবুলি ভাষায় রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' দেখিয়া এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্রজবুলির সংস্কার এই দেশের সমাজ হইতে তখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু মধুসূদন তাহার দাসত্ব করেন নাই, তাঁহার ভাষা ভারতচন্দ্রের ভাষার অনুকরণ, বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষার অনুকরণ নহে।

মধুসূদনব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 'বিরহে' যেমন ভাব-সম্মিলন নাই, তেমনই গৌরচন্দ্রিকাও নাই। গৌরচন্দ্রিকা বৈষ্ণব কবিতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গৌরচন্দ্রিকা ব্যতীত বৈষ্ণব কবিতা হয় না, মধুসূদন তাঁহার রচনায় এই রীতিকেও অনুসরণ করিতে যান নাই। প্রত্যেকটি কবিতার শেষে মধুসূদন নিজের নামে যে ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব পদাবলীরই একটি নিজস্ব রীতি, তাহা নহে—চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী ইত্যাদি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল শ্রেণীর রচনা মাত্রেই এই ভণিতা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল—ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের উপর ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর যতখানি প্রভাব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ভারতচন্দ্রের প্রভাব তদপেক্ষা বেশি বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'কে 'বিরহ' বলিয়া উল্লেখ করিলেও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সকল বিষয় 'বিরহ'-প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্তও নহে, বরং অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকেও তিনি তাঁহার পরিকল্পিত 'বিরহ'-প্রসঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতায় বিরহের বহু পূর্ববর্তী একটি বিষয় 'বংশীধ্বনি', ইহা হইতেই শ্রীরাধিকার মনে শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি প্রথম অনুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ, এমন কি, বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'বংশীখণ্ডে' বিষয়টি বিরহের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মধুসূদন তাহা 'বিরহে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। নিম্নে ইহার দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করা যাক্ঃ

বৈষ্ণব কবিতায় 'বসন্ত ঋতু' মিলোনৎসবের ঋতু, ইহাতে প্রকৃতির রূপৈশ্বর্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে প্রিয়-মিলনের আকূতি দেখা দেয়; বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের মিলন এই সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এই ঋতুর বর্ণনায় বৈষ্ণব কবির চিত্তের উল্লাস নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—বসন্তে বিরহ নাই, ইহা মিলনের ঋতু, ইহা রসোল্লাস অভিব্যক্তির পরম মুহূর্ত, ইহাতে বেদনা নাই, ইহাতে বিচ্ছেদ অভাবনীয়, কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

শিশিরক অন্তবে আওযে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক বঙ্গ।
ভোরল মধুকব কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সাবী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহি সব, বঙ্গিনি, মেলি এক সঙ্গে।
ভেটল নাগরি নাগর বঙ্গে॥
বিরহই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত বঙ্গিনি-জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥

কিন্তু মধুসূদন বসন্ত ঋতুব প্রসঙ্গ আনিয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার ভিতর দিয়া বিরহের বেদনা অনুভব করিয়াছেনঃ

ফুটিল বকুলফুল কেন গো গোকুলে আজি
কহ তা' সজনি?

আইলা কি ঋতুরাজ? ধবিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী?
মুছিয়া নয়ন জল, চললো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণবিরহিত গোকুল-বৃন্দাবনে বসন্ত নাই, শ্রীরাধার দৃষ্টি তখন একান্ত অন্তর্মুখী—অন্তরের আকাশে সেখানে ঘন বর্ষার মেঘোদয় দেখা দিলেও তাহাতে ঋতুরাজ বসন্তের কোন স্থান নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'বংশীধ্বনি' পূর্বরাগের বিষয়, বিরহের বিষয় নহে; কারণ, যেখানে বিরহ, সেখানে শ্রীরাধার বংশীধ্বনিও ত শুনিবার কথা নহে। চৈতন্য পূর্ববর্তীকাল হইতেই বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় বংশী-ধ্বনিকে পূর্বরাগের বিষয় বলিয়াই কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, পদাবলী রচনার যুগেও সেই ধারাটি পুষ্ট হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'বংশী-খণ্ডে'র অন্তভুক্ত এই পদটি সুপরিচিত এবং পদাবলীর যুগেও ইহারই প্রতিধ্বনি সর্বত্র শুনিতে পাওয়া গিয়াছে ঃ

কে না বাঁশী বায় বড়াই কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বায় বড়াই এ গোঠ-গোকুলে॥

কিন্তু মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় 'বিরহে'র মধ্যেই 'বংশীধ্বনি' নামক একটি পদে লিখিয়াছেন ঃ

কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে গো মনে?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?
বসন্ত-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে?

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে !

ইহা হইতে মনে হয়, কবি মনে করিয়াছেন, শ্যাম-বিরহিত বৃন্দাবনে অন্য এক ব্যক্তি বাঁশী বাজাইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে বাঁশী বাজাইতে শিখিবার কালে একবার বাঁশী লইয়া নিজে বাজাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও বাঁশী বাজাইবার কথা নাই,—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াই রাধার হৃদয় সর্বদা আকুল হয়, অন্য কাহারও বাঁশীতে নহে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সাধারণ প্রেমাখ্যানের নায়ক মাত্র নহেন—তিনি পরমাত্মা ; কিন্তু মধুসূদনের শ্রীকৃষ্ণ পার্থিব সংসারের একজন প্রেমিক মাত্র। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কয়েকটি রোমান্টিক গীতিকবিতার সমষ্টি মাত্র, ইহা বৈষ্ণব কবিতা নহে।

একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মনে হয়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যেই মধুসূদনের গীতিকবিতা রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। কারণ, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রাচীন পদ্ধতির মহাকাব্যের ছায়াতলে রচিত, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেও ছন্দ ও মিল সম্পর্কিত নিয়মের যে নিগড়-বন্ধন রহিয়াছে, তাহাও অনেকাংশে গীতিকবিতার স্বাধীন রস-স্ফূর্তির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' এই সকল ত্রুটি নাই।

৪

'অন্নদামঙ্গল' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবযুগের নূতন জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইলেও মধুসূদন পূর্ববর্তী শতাব্দীর বাঙ্গালীর প্রাচীন ধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় এইভাবে ভারত-চন্দ্রের অমর কীর্তি 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন,

> মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
> পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
> অন্নদা! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
> অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
> দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
> রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
> রাজলক্ষ্মী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরী
> ভাসিবে অনেকদিন, জননীর বরে।
> কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
> চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল;
> তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে?
> তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদা-মঙ্গল—
> যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
> রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥

কাব্যের বহিরঙ্গ গঠনের কতকগুলি বিষয়ে ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনের মধ্যে যেমন ঐক্য ছিল, তেমনই ইহার অন্তর্মুখী ভাব-প্রকৃতিতেও ইহাদের উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এইজন্যই অনেকে ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা মধুসূদনের পরিবর্তে ভারতচন্দ্রকেই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া নির্দেশ করিবার পক্ষপাতী। ইহা সত্য না হইলেও এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারত-

চন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য ছিল। ভারতচন্দ্র যেমন শিল্পী, মধুসূদনও শিল্পী, তবে মধুসূদন তাহার উপর—তিনি কবি। কবিদেহ গঠনে শিল্পীনিপুণতার যে বিশেষ দাবী আছে, বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পর মধুসূদনই তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যবর্তীকালীন আর কোন কবি সে দাবী পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাষার যে ঐশ্বর্যই প্রকাশ পাক, তাহা যে গীতি-কবিতার রসাক্রান্ত তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন; সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, মহাকাব্যের কবির পক্ষে গীতিকবিতার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইবার কোন কারণ নাই, তাঁহারাও মধুসূদনের মধ্যে গীতি-প্রাণতার সন্ধান করিতে পারিলে এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই গীতিকবিতার সুর বাঙ্গালীর কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে যে সার্বভৌম প্রভাব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া মধুসূদনের মধ্যে গীতি-প্রাণতার বিকাশ হইয়াছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় রস-ধারার এই ঐতিহ্যের সঙ্গেই মধু-সূদনের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য ভাব-প্রেরণা আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া যদি এই কথা কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, অন্তরে এবং বাহিরে তিনি সম্পূর্ণই খৃষ্টান, তাহা হইলে তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল প্রকৃতি-সম্পর্কেই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়; কারণ, এ'কথা সত্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়াও যে গীতিকবিতার সুর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্বতোভাবেই অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার রসাশ্রিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহিরঙ্গে যেমন চৌদ্দ অক্ষরের পদ-সীমা রক্ষা করিয়া তিনি বাংলা পয়ারের বহিরঙ্গ গঠনের প্রতি আনুগত্য দেখাইয়াছেন, তেমনই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই হউক কিংবা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ই হউক তিনি গীতিকবিতার প্রবাহ যেভাবে নিরবচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় রস-চেতনার প্রতি তিনি আনুগত্য দেখাইয়াছেন; অবশ্য বহির্মুখী আনুগত্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কাজ করেন নাই, তাঁহার জীবনের সাধনার মধ্য দিয়া যে একটি

আন্তরিকতা ছিল, তাঁহারই সূত্রে জাতীয় রস-চেতনার সঙ্গে তাঁহার যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সূত্রেই ভারতচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহার যোগ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই যোগ যে কতখানি দৃঢ় ছিল, তাহা পূর্বোক্ত 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতার পরও 'ঈশ্বরী পাটনী' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাহাতে প্রথমেই ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদা-মঙ্গল' হইতে এই সুপরিচিত পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'।

তারপর তিনি লিখিয়াছেন,

কে তোর তরীতে বসি, ঈশ্বরী পাটনী ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্বে সুবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,-
কনক-কমল-ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ' রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়। এ নব-যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে :
বলে, বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাংলার নব-যুগের কাব্যবাণীর প্রথম উদ্গাতা হইলেও তাঁহার মধ্য হইতে প্রাচীন জীবনের সংস্কার সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই, ঐতিহ্যের সঙ্গে এই যোগ রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়াই মধুসূদনের সৃষ্টিতে এত শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সেই যোগ যদি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, তবে তাঁহার এই শক্তি প্রকাশ পাইত না।

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার পরিবর্তে তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মধ্যে গীতিকবিতার বহির্মুখী যে ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র মধ্যে তাহারই পূর্ণতর প্রকাশ দেখা গিয়াছে ; দুই একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে না।

এই কথা সকলেই জানেন, ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদা-মঙ্গল' রচনার মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিবার সূচনায় এক একটি ধুয়া (ধ্রুবপদ) নামক গীতি রচনা করিয়াছেন। 'অন্নদা-মঙ্গলে'র অন্তর্গত প্রথম খণ্ড বা অন্নপূর্ণা-খণ্ডে তাহা হরগৌরীবিষয়ক, দ্বিতীয় খণ্ড বা বিদ্যাসুন্দর অংশে তাহা প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। অবশ্য শ্রীরাধার বিরহই ইহার একমাত্র বিষয় নহে। পূর্বে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও দেখা গিয়াছে যে, যদিও মধুসূদন তাহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বিরহ বিষয়কেই মুখ্যত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ তিনি রচনা করিতে পারেন নাই—ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণ হইয়াছে। ভারতচন্দ্র রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে যে সকল ধুয়া বা ধ্রুবপদ রচিত হইয়াছে, তাহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হইলেও, একমাত্র বিরহ তাহার উপজীব্য নহে। একটি গীতি এখানে উদ্ধৃত করিলেই ইহার মধ্যে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সুর ধরা পড়িবে। ভারত-চন্দ্রের একটি ধুয়া এই প্রকার ঃ

ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু।
পীতধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে॥
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর।
মুখ-সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে॥

নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে ॥
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও।
ভারত যে মত চাহে সেইমত চাও হে ॥

মূল 'অন্নদা-মঙ্গল' কিংবা বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সঙ্গে এই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-প্রসঙ্গের কিছু মাত্র যোগ নাই, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মন হইতে রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দৈবী প্রেমের লীলাক্ষেত্রে যে মানব-মানবীর লৌকিক প্রণয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, ভারতচন্দ্রের এই পদ তাহারই ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এক শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া সেই ভাবেরই প্রবাহ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের কাব্যেও ভক্তিভাবের যে কোনও স্পর্শ অনুভব করা যায় না, তাহা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সঙ্গে ভারতচন্দ্রের রচনার তুলনা করিবার জন্য এখানে আরও কয়েকটি পদ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে ॥
বনমালী মেঘমালী কালিয়া রে ॥
মোহন মালার ছাঁদে রতি-কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ-অনলে দেই জ্বালিয়া রে।
যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে ॥
নাসা তিল ফুল পরে অঙ্গুলি চম্পকে ধরে
নয়ন-কমল কামে টলিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলি চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিযা রে ॥

২

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥

আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মঙ্গল কলস, হায়, চরণে ঠেলিলে ॥
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি-ছাড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে।
মন তারে পরিহার সাধি আনি আরবার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে ॥

৩

আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥
লুকায়ে পীরিতি কৈনু কুল-কলঙ্কিনী হৈনু
আপনি পরাণ মোর অকূল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে
আকুল করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে ॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
ভারত সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে ॥

৪

এত বড় চতুর চোর।
গোকুলের নন্দ কিশোর ॥
নারিনু রাখিতে দেখিতে দেখিতে
চিত্ত চুরি কৈল মোর ॥
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেমন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া বাঁশী বাজাইয়া
ভারত করিল ভোর ॥

৫

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণীমণ্ডল-ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা দিবস দুপুর বেলা
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসন-চোরা তাহারে ধরিব মোরা
পীত-ধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে
ভারত রহিবে পহরিয়া।

৬

কারে কব লো সে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার॥
বাধা আছি কুল-ফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না দেখিয়া শ্যাম চাঁদে দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর॥
শ্যাম অখিলের পতি তা'রে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥

৭

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যাম রায়॥
কংসের গায়ন যারা সে বীণা বাজায় তারা
বীণা সে গোবিন্দ-গুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস হৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায়॥

বীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুটিব এ' চরণ-ধুলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শত্রুভাবে মিত্র পদ পায়॥

৮

মোর পরাণ-পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব বাধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা॥
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধা-কৃষ্ণের বাঁধা॥

৯

ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গায়ো না।
তনু মোর হৈল যন্ত্র যত শিব তত তন্ত্র
আলাপে নাচিল মন মাতালে নাচায়ো না॥
তুমি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে কয়ে কয়ে মুরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥

১০

কি বলিলি, মালিনী, ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥

শিহরিল কলেবর তনু কাঁপে থর থর
হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ কুলের মাথায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল।
রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিত্ত না ধৈরয ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যাম রায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায ভাবে ঢল ঢল॥

এই সর্বশেষ উদ্ধৃত পদটির সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র একটি কবিতার ভাষাগত ঐক্যও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহাতে মধুসূদন লিখিয়াছেন,

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ' প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকা রমণ ?

ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে'র 'বিদ্যাসুন্দরে'র অন্তর্ভুক্ত উদ্ধৃত পদগুলি অনুসরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ব তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ভারতচন্দ্রও যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অনুসরণ করিয়া তাঁহার পদগুলি রচনা করেন নাই, মধুসূদনও তাহা করেন নাই। ভারতচন্দ্রও মঙ্গলকাব্য-দেহের মধ্যেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এক শতাব্দী পর বাঙ্গালীর চিত্তাকাশে নব সূর্যোদয়ের পরম মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়াও মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় ভারতচন্দ্র দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া সেদিন মধুসূদন তাঁহার দৃষ্টি বৈষ্ণব কবিতার দূরতর, অতীতে বা কল্পলোকে বিস্তার করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার সমগ্র 'অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে' যতগুলি এই শ্রেণীর পদ রচনা করিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা

কাব্যে' তদপেক্ষা অনেক অল্প সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন ; ভারতচন্দ্রের রচিত পদ একই সুরে বাঁধা হইলেও যেমন রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বিভিন্ন বিষয়াশ্রয়ী, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র পদগুলি 'বিরহ' নামাঙ্কিত হইলেও বিরহের অনুভূতি ইহাদের মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠে নাই—বিভিন্ন বিষয়ে তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র যেমন বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন নাই, মধুসূদনও তাহা করেন নাই। ইঁহাদের কাহারও মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ভাব, আদর্শ ও ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই ; অথচ ইঁহাদের দুইজনের ভাব, আদর্শ ও ভাষা অভিন্ন। সুতরাং মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবির উত্তরসাধক নহেন—ভারতচন্দ্রের উত্তরসাধক মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কোন সম্পর্ক ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার মধ্যে ইহার উদ্ভব এবং গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তাঁহার শিষ্যদিগের ধ্যান ও কর্মের ভিতর দিয়া তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তথাপি এই কথা সত্য, গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক রচনায় বহু সঙ্গীতের মধ্য দিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রভাব বহির্মুখী মাত্র, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র অন্তর্মুখী কোন প্রেরণা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক চিন্তায় কার্যকরী হইতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র যে রাগিণীটি ধরিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদনের মধ্যে আসিয়া তাহা নীরব হইয়াছে মাত্র।

৫

আধুনিক গীতিকবিতা ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' বৈষ্ণব কবিতা নহে; এখন আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়, আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণই বা ইহাতে কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক গীতিকবিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রেরণা-জাত এবং ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, ইহাতে বিষয়ের সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্ব একাকার হইয়া যায়—বিষয় হইতে কবি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। কবির অনুভূতির মধ্যে যে সর্বজনীনত্ব আছে, তাহার গুণেই তাহা কবির নিজের হইয়াও সাধারণের হৃদয়ানুভূতির অনুগামী হয়। বিষয়-বস্তুর সঙ্গে কবি-চিত্তের সম্পর্ক যত নিবিড় হয়, গীতিকবিতার ততই সার্থকতা। ইংরেজ কবি শেলীর To a Skylark নামক কবিতাটির শেষ পংক্তিটি ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়ঃ

Higher still and higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire,
The blue deep thou wingest
And singing still dost soar, and soaring ever singest,

* * * *

Teach me half the gladness
That thy brain must know
Such harmonious madness
From my lips would flow
The world should listen then as I am listening now.

কবি এখানে নিজের একান্ত সজাগ দৃষ্টি ও অনুভূতি লইয়া চাতক

পক্ষীর আকাশ-বিহার লক্ষ্য করিয়াছেন, এখানে পক্ষীর বাস্তব পরিচয় অপেক্ষা কবি-হৃদয়টি বড় হইয়া উঠিয়াছে; কবি যাহা ভাবিতেছেন, আকাশ-বিহারী পক্ষীর মনে সেই আনন্দের বিন্দু মাত্রও হয়ত কিছু নাই। এখানে সুনীল নভোমণ্ডলে বিন্দুবৎ প্রতীয়মান পক্ষীর মনে একটি অপার্থিব আনন্দের উদয় হইয়াছে এই কথা ভাবিয়া কবি-চিত্ত যে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই কল্পনায় কবি পক্ষী-চিত্তের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এখানে চাতক পক্ষী, তাহার সঙ্গীত, তাহার উদার আনন্দ—ইহাদের পরিকল্পনার ভিত্তিস্থান কবির চিত্তভূমি, সেইজন্য বস্তু অপেক্ষা তাহাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার লক্ষণ।

এই লক্ষণ যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' প্রকাশ পায় নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়; ইহার বিষয়ের সঙ্গে কবি-চিত্তের এই সুনিবিড় যোগ দেখা যায় না। যথার্থ বৈষ্ণব কবিতা না হইলেও ইহার বিষয়বস্তু বৈষ্ণব-প্রসঙ্গ-ভিত্তিক—কবির স্বাধীন রসানুভূতি অভিব্যক্তির ইহাতে অবকাশ নাই। ইহা শ্রীরাধার বিরহ, কবির মনে যদি কোন কথা এখানে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা শ্রীরাধার মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে, সর্বসংস্কারমুক্ত স্বকীয় কবি-চিত্তের স্বাধীন অভিব্যক্তির ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরাধার উল্লেখ থাকিলেই যে তাহা গীতিকবিতার রস হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহা নহে—শ্রীরাধার পরিকল্পনা যদি একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন ধর্ম বোধ হইতে উৎসারিত হয়, তাহা গীতিকবিতার বিষয়ীভূত না হইলেও, ইহা যদি বিশ্বমানবের সার্বভৌম প্রেমানুভূতির প্রতিনিধি হয়, তবে তাহা অবলম্বন করিয়াও আধুনিক গীতিকবিতার সৃষ্টি হইতে পারে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃত কি হইয়াছে, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' শ্রীরাধার বিরহ সম্পর্কিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতার সমষ্টি—কবিতাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কতকটা ভাব-গত ঐক্য ব্যতীত বিষয়গত ঐক্য নাই। কবি বিভিন্ন কবিতায়

বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন, যেমন 'বংশীধ্বনি', 'জলধর', 'যমুনাতটে', 'ময়ূরী', 'পৃথিবী', 'প্রতিধ্বনি', 'ঊষা', 'কুসুম', 'মলয়-মারুত', 'বংশী-ধ্বনি', 'গোধূলি', 'গোবর্ধন গিরি', 'সারিকা', 'কৃষ্ণচূড়া', 'নিকুঞ্জবনে', 'সখী' ও 'বসন্তে'। ইহারা পর পর রচিত হইয়া সেইভাবেই প্রকাশিত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়া কোন যোগসূত্র নাই—ইহাদিগকে প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা; যেভাবে ইচ্ছা ইহাদেরে পর পর সাজাইয়া লওয়া যাইতে পারে—তাহাতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মূল ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। এমন কি, দেখা যাইবে, ইহাতে 'বংশীধ্বনি' বিষয়টি লইয়াই দুইটি কবিতা রচিত হইয়াছে। তারপরও এই দুইটি কবিতায় ভাবগত কোনও ঐক্যও নাই। প্রথমটিতে বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার আনন্দ-অভিলাষ ও দ্বিতীয়টিতে কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবনে অন্য এক ব্যক্তির 'বংশীধ্বনি' শুনিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম স্মরণ করিয়া ব্যাকুলতার কথা আছে। শেষোক্ত কবিতাটি মূল বৈষ্ণবভাবের বিরোধী—কারণ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতেই শ্রীরাধার আকর্ষণ, অন্য কাহারও বাঁশীতে নহে। কবিতা দুইটি পরস্পর স্বাধীন—ইহাদের বিষয় ও ভাব অভিন্ন নহে। অতএব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' আদ্যোপান্ত একটি মাত্র ভাবের প্রবাহ অখণ্ডভাবে অগ্রসর হইয়া যায় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও বিভিন্ন ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, এই বহির্মুখী বিষয়গুলিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' গীতিকবিতার লক্ষণ হইতে মুক্ত নহে।

এমন কি, যদিও মধুসূদন তাঁহার কাব্যের নাম 'ব্রজাঙ্গনা' এবং বিষয়-বস্তুকে 'বিরহ' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার 'ব্রজাঙ্গনা'ত্ব যেরূপ প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনই শ্রীরাধারই হউক কিংবা সাধারণ মানবী নায়িকারই হউক, বিরহ ভাবও সর্বত্র সমান স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম কবিতাটিও 'বিরহ'-বিষয়ক নহে। ইহাতে আছে,

নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলীরে
রাধিকা-রমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল-রতন !

ইহা যে বিরহিণী রাধিকার স্বপ্ন মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে রসোল্লাসবতী রাধিকার আসন্ন প্রিয়মিলনের আনন্দানুভূতি, তাহা কবিতাটির এই শেষাংশ হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে ঃ

মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে ! স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ভাবে তোমা শ্রীমধুসূদন।
যৌবন মধুর কাল আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

ইহাতে বিরহের বেদনা নাই—মিলনের আশ্বাসই আছে। এই ভাবে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সর্বত্রই বিরহ-বিষয়ের ভাবগত রসনিবিড়তাও যে রক্ষা পাইয়াছে, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। সুতরাং গীতি-কবিতার যে প্রধান গুণ, ভাব ও বস্তুগত খণ্ডতা, তাহা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' আছে।

রাধা এবং কৃষ্ণের কথা আছে বলিয়াই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত হইবে না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখানে রাধা যেমন বৈষ্ণব সংস্কার অনুসরণ করিয়া আসেন নাই, কৃষ্ণও এখানে একেবারেই উপস্থিত নাই।

আধুনিক গীতিকবিতা কবির একান্ত আত্মভাবপরায়ণ (subjective) রচনা। এই বিষয়ে মধ্যযুগের গীতিকবিতার সঙ্গে ইহার পার্থক্য আছে। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যযুগের গীতিকবিতা গোষ্ঠী-চেতনার ফল ছিল। বাংলার বৈষ্ণব কবিতাও তাহাই। একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক চেতনা হইতে জন্ম লাভ করিয়াও কেবলমাত্র ভাব-রসের একটি সার্বজনীন আবেদনের গুণে ইহা কবিতার গৌরব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার মর্মমূলে গোষ্ঠী-চেতনার কোন প্রেরণা নাই—ইহা কবির একান্ত ব্যক্তি-অনুভূতির ফল।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও বিষয় এবং ভাব যেভাবে বিন্যাস করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া মধ্যযুগসুলভ গোষ্ঠী-চেতনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় নাই। ইহার নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে ব্রজবধূর ভাগবত-কথিত আচার আচরণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, ইহার বিষয় বিন্যাসের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না, ইহার অনুভূতির মূলে বৈষ্ণব কবিতাব ভক্তি-বোধের একান্ত অভাব; কোনও নিয়ম ও নীতি-নির্দেশ মাথায় পাতিয়া লইয়া কবি ইহা রচনা করেন নাই। প্রাচীন বিষয় (classic) অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য রচনার যে প্রেরণা মধুসূদনের মধ্যে তখন দেখা দিয়াছিল, তাহারই পটভূমিকায় তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা কবিয়া তাঁহার অন্তরের গীতিভাবকে সেদিন মুক্তি দিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই রাধার নাম এবং বৃন্দাবনের চিত্র ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

মধুসূদনের মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার প্রেরণা প্রথম হইতে সক্রিয় থাকিলেও গীতিকবিতার বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সংস্কার-মুক্তি তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার পূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্লাসিক আদর্শে তাঁহার মানস পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল, এই বিষয়ে তাঁহার রক্ষণশীলতার পরিচয় তাঁহার ইউরোপ প্রবাসের পূর্বে রচিত সকল সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই সূত্রেই তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বহিরঙ্গে বৃন্দাবনের চিত্র ও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আসিয়াছে, নতুবা ইহার অন্তর্মুখী প্রাণধারায় আধুনিক গীতিকবিতার রসই সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইংরেজ কবি কীট্‌স্ আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার চেতনা দ্বারা প্রাচীন গ্রীসের স্বপ্নরূপকে যেমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে অনুরূপ প্রয়াস কতদূর সার্থক হইয়াছে? এই বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইংরেজ কবি কীট্‌সের সুতীব্র আত্মসচেতনতা, কিংবা মন্ময়তা মধুসূদনের ছিল না; যদিও গীতিকবিতা রচনার প্রেরণাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক প্রেরণা, তথাপি এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার কবি-

মানসের পটভূমিকাটি ক্লাসিকধর্মী ছিল—এই বিষয়ে তিনি যতখানি হোমার, দান্তে, ওভিদ, মিল্‌টনের সমধর্মী, ইংরেজ রোমান্টিক কবিদিগের ততখানি সমধর্মী ছিলেন না। ইংরেজ কবি কীট্‌সের কবিতায় কবি-চিত্তই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, বস্তু অপেক্ষা বক্তব্যটি বড় হইয়াছে। মধুসূদনের রোমান্টিক চেতনা সেই স্তরের ছিল না, তিনি বস্তুকে অতিক্রম করিয়া গিয়া ব্যক্তিত্বকেই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই—তবে ইউরোপ প্রবাসকালীন রচিত তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার মধ্যে তাঁহার এই ত্রুটি হইতে তিনি অনেকখানি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি এই কথা অস্বীকার করা যায় কি, যে শ্রীরাধার বেদনার মধ্য দিয়া কবিরই নিজ জীবনের আত্মবিলাপের সুর ধ্বনিত হইয়াছে? 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র যে কোন একটি কবিতাই যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে কবির নিজ জীবনের বেদনা ও বৈরাগ্যের অনুভূতি যে খুব গোপন হইয়া আছে, তাহাও বোধ হইবে না। 'যমুনা-তটে' কবিতায় শ্রীরাধার মুখ দিয়া যে তিনি বলিয়াছেন,

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে।
দু'জনের মনোজ্বালা জুড়াই দু'জনে;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে।

ইহাই কি তাঁহার 'আত্মবিলাপে'র সুর নহে? তবে 'আত্মবিলাপে'র মধ্যে যে কবির আত্মানুভূতির তীব্রতা আছে, শ্রীরাধার মাধ্যমে প্রকাশ পাইবার জন্য ইহা হইতে সেই তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। 'আত্মবিলাপে' প্রত্যক্ষতার (directness) যে একটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি হইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তাহা নাই; তবে এখানে রাধার বিলাপই যে কবির 'আত্মবিলাপ' তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র নিম্নোক্ত পদগুলির সঙ্গে তাঁহার রচিত 'আত্ম-বিলাপে'র ভাষা ও চিত্রগত ঐক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি লিখিয়াছেন,

মধু কহে, হে কামিনী, আশা মহা মায়াবিনী !
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে, সতি ?

'আত্মবিলাপে' তিনি লিখিয়াছেন—

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।

* * * *

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা ক্লেশে।
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

মধুসূদন রচিত 'আত্মবিলাপে'র নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশের মধ্যে যেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধার সমগ্র বেদনাটি স্তম্ভিত হইয়া আছে ঃ

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে।
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ জীবনের খণ্ড খণ্ড বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া যে আধুনিকধর্মী গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত করেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত হইতে মধুসূদন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' নিসর্গভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় লইয়াই রচিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নিসর্গ-চেতনার ভিতর দিয়া তাঁহার কবি-চিত্ত যে ভাবে স্পন্দিত হইয়াছে, ঈশ্বর গুপ্তে তাহার লেশমাত্রও হয় নাই; সেইজন্য ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার বহিরঙ্গের স্রষ্টা বলা গেলেও মধুসূদন তাহার প্রাণদাতা—'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তাঁহার সেই প্রয়াস একটি বৃহত্তর পরিচয়ের ভিতর দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

৬

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' শ্রীরাধা-চরিত্র

শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদনার রূপটি নিজের ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে স্থির করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' শ্রীরাধার চরিত্র চিত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কারণ, তিনি সংস্কৃত কাব্য 'পদাঙ্কদূত' হইতে যে শ্লোকটির এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কাব্য রচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদিনীর রূপ বর্ণনা :

গোপীভর্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্‌।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্জুকুঞ্জং জগাম ॥

কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আক্ষেপানুরাগের ভিতর দিয়া শ্রীরাধা-চরিত্রে দিব্যোন্মাদনার যে ভাবমহিমা বিকাশ লাভ করে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা চরিত্রে তাহার অবকাশ নাই। কারণ, 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা-বিরহ পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন এক বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ অনুভূতি মাত্র; বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাধা-চিত্তে যে সুগভীর কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করা সম্ভব হইয়াছে, পূর্বপরিচয়বিহীন 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা চরিত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা-বিরহে উন্মাদনা থাকিলেও তাহার মধ্যে 'দিব্য'ত্ব কিছুই নাই। সুতরাং ইহার রাধা-চরিত্র, মধুসূদনেরই ব্যক্তি-চেতনার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি; দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার স্বপ্নরূপ মধুসূদনের ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিলেও, তাহা তাঁহার সৃষ্টিতে রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতএব এই ক্ষেত্রে 'পদাঙ্কদূত' হইতে উক্ত শ্লোকের অংশ উদ্ধৃতির কোন সার্থকতা নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকা পূর্বরাগেই হউক, আক্ষেপানুরাগেই হউক, কিংবা বিরহেই হউক কৃষ্ণধ্যানে নিজের অন্তর ও বাহিরকে

একাকার করিয়া লইয়াছিলেন, বহির্বিশ্বের বস্তুভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল—কালোরূপের মধ্যে কৃষ্ণরূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতেন না ঃ

এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীখনে।

ময়ূরের নীলকণ্ঠে তিনি নবঘনশ্যাম মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়াছেন,

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ।

তাঁহার নিকট মেঘ কেবল মেঘ নহে, চোখের কাজল কেবল কালো কাজল মাত্রই নহে—ইহারা কৃষ্ণরূপের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকার নিকট 'জলধর' মেঘই, তাহা অতিক্রম করিয়া আর কিছু নহে ঃ

চেয়ে দেখ, প্রিয় সখি, কি শোভা গগনে!
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন,
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ-মনে!
ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে!

তিনি বর্ষার মেঘাড়ম্বরের মধ্যে 'মদন উৎসবে'র পরিচয় পাইয়া থাকেন ঃ

মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন।

কেহ কেহ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকাকে বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতে যেমন দেখা গিয়াছে যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' যেমন বৈষ্ণব কবিতা নহে, তেমনই ইহার রাধা-চরিত্রও বিদ্যাপতি কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকা নহে। ভাদ্রের ভরা বর্ষায় বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধিকা বহির্জগতের মেঘ গর্জনের মধ্যে নিজের অন্তরের রিক্ততায় যে সুগভীর বেদনা-বোধ করিয়াছেন, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকার মধ্যে তাহা দেখা যায় না। বিদ্যাপতির

এই দুইটি পদে যে ভাব-নিবিড়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সুবিস্তৃত রচনা 'জলধর' কবিতাটির মধ্যে নাই ঃ

সখি রে, হামারি দুখের নাহি ওর,
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে।

বৈষ্ণব কবিতায় বর্ষায় যে মেঘোদয় হয়, তাহা বাহিরের আকাশে হয় না, বরং শ্রীরাধার মনের আকাশেই ইহার উদয় হয়; কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বাহিরের আকাশে যে মেঘ সঞ্চার হয়, তাহা ক্বচিৎ শ্রীরাধিকার মনের উপর ছায়া বিস্তার করিতে পারে।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকা দিব্যপ্রেমোন্মাদিনী নহেন—বরং তিনি 'মদন-রাজা'র অধীনা। তিনি বলিয়াছেন যে, 'মদন রাজার বিধি' লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কাছে যায় ঃ

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি রুষিবে সম্বর-অরি,
কে সংবরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে?

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি বর্ষার মেঘোদয়ের মধ্যে 'মদন-উৎসবে'র রূপ দেখিতে পাইয়াছেন ঃ

মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে,
রতিপতি সহ রতি ভুবন-মোহন!
চপলা চঞ্চলা হয়ে হাসি প্রাণনাথে লয়ে,
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন-আলিঙ্গন!

শ্রীরাধিকা নিজেকে রতি এবং শ্রীকৃষ্ণকে রতিপতি মদনরূপে কল্পনা করিতেছেন,

আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে
পতিহারা রতি কি লো, পাবে রতি-পতি?

একদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন 'নিকুঞ্জবনে' কোকিল যে গান গাহিত, তাহা শ্রীরাধার মনে আজ 'মদন-কীর্তন' বলিয়া মনে হইল :

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্তন,—

তিনি বার বার নিজেকে 'রাধিকা-রমণ' এবং 'কাম-বধূ'র সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন,

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকা-রমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু—
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত কোথা আজি তোমার মদন ?

শ্রীকৃষ্ণকে তিনি তাঁহার যৌবন উপহার দিতে চাহেন :

সখিরে, এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে।

এই সকল উদ্ধৃতির মধ্য হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বৈষ্ণব কবিতার দিব্যোন্মাদনার ভাব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা-চরিত্রের ভিতর দিয়া ত প্রকাশ পায়ই নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এক অতি স্থূল রস-রুচিসম্পন্না প্রোষিতভর্তৃকা নারীর পরিচয়ই তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ, মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীকে অনুসরণ না করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাসুন্দর'কে অনুসরণ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রাধিকা বৈষ্ণব কবিতার রাধা না হইয়া 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে'র নায়িকা বিদ্যা-চরিত্রের অনেকটা অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটি একটু কঠিন হইলেও সত্য।

৭

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র দূরপ্রসারী প্রভাব

মধুসূদন দত্ত রচিত কেবল মাত্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'রই ছন্দ, ভাব ও ভাষা যে তাঁহার পরবর্তী বাংলা মহাকাব্য রচনায় ব্যাপক প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, তাহাই নহে,—পরবর্তী গীতিকবিতা রচনার ধারায় তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও ইহার প্রায় সমকক্ষই বলা যাইতে পারে। মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচিত হইবার পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রবর্তিত আধুনিক গীতিকবিতা রচনার ধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন হইতে গীতিকবিতা রচনা বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পরিবর্তে মধুসূদনই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হন। তবে অনতিকাল ব্যবধানেই বাংলা গীতিকবিতায় একটি নূতন সুরের যোজনা হইল, তাহা বিহারীলাল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রবর্তিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিপুষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিহারীলালের মধ্যে এই বিষয়ে যে মৌলিকতাই থাকুক না কেন, বিহারীলালের সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের দ্বারাও যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে কতকটা প্রভাবিত না হইয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। অবশ্য স্বকীয় প্রতিভার মৌলিক শক্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র মধুসূদনের কেন, বিহারীলালেরও প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি একদিক দিয়া যেমন বিহারীলাল আর একদিক দিয়া তেমনই মধুসূদনের প্রভাবেরও বশবর্তী হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত সহযোগে সে কথা পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের ধারা বাদ দিলে মধুসূদনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা রচয়িতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের কবি বলিয়া অধিকতর পরিচিত হইলেও, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার মধ্যে যে একটি গীতি-কবির প্রাণ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার মহাকাব্য রচনার মূলে বিসর্জন দিতে পারেন নাই ; বরং এই পরিচয়টিই তাহার সহজ, স্বাভাবিক এবং

তাঁহার নিজস্ব প্রতিভার একান্ত অনুগামী ছিল, তাহার তুলনায় তাঁহার মহাকাব্য রচনার প্রতিভা নিতান্ত গৌণ ছিল। তিনি তাঁহার গীতি-কবিতা রচনার ধারায় মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' দ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল মহাকাব্য রচনাতেই মধুসূদন হেমচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন না, গীতিকবিতা রচনাতেও তিনি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্বীকার করিবার পরিবর্তে মধুসূদনের প্রভাবকেই স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে।

মধুসূদন রচিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র অন্তর্গত একটি গীতিকবিতার নাম 'যমুনা-তটে' ; তাহাতে মধুসূদন লিখিয়াছেন,

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে!
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?

তপন-তনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে সৌরভ জনমে ফুলে,
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী?

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ' বিরলে।
দু'জনের মনোজ্বালা জুড়াই দু'জনে,
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে!

বসো আসি, শশিমুখি! আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমল-বাসিনী!
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,

ক্ষণেক ভুলি এ' জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি ;
এস গো বসি দু'জনে এ' বিজন স্থলে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'যমুনা-তটে' কবিতার দুইটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার অন্তর ও বহির্মুখী পরিচয়ে মধুসূদন রচিত উপরি উদ্ধৃত 'যমুনা-তটে' কবিতার প্রভাব কত স্পষ্ট। হেমচন্দ্র তাঁহার 'যমুনা-তটে' কবিতায় লিখিয়াছেন,

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীবাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী জল।
কুসুম-পল্লব-লতা নিশাব তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শবীর জুড়ায়,
জোনাকিব পাঁতি শোভে তরুশাখা 'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জগৎ ঘুমায়,—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।
কে আছে এ ভূমণ্ডলে যখন পবাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাডনে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ' শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত-উপরি,
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে।
কি সুখ যে হেন কালে গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

মধুসূদন রচিত 'যমুনা-তটে' কবিতায় শ্রীরাধিকার নামটুকু অবলম্বন করিয়া বাংলা কাব্যে রোমান্টিক চেতনা জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাই হেমচন্দ্রের রচনায় স্পষ্টতর হইয়াছে মাত্র—এখানে শ্রীরাধিকার নাম না থাকিলেও মধুসূদন রচিত 'যমুনা-তটে'র প্রাণ ও বহির্মুখী অন্যান্য পরিচয় আনুপূর্বিক রক্ষা পাইয়াছে। ইহা বাংলা কাব্যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়াই সম্ভব হইয়াছে—হেমচন্দ্রের স্বাধীন ব্যক্তি-চেতনার ফলে হয় নাই। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব-জাত হেমচন্দ্রের রচনা হইতে আরও কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাঁহার 'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতাটিও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব ও রসের সুরে যে বাঁধা, তাহা এই সামান্য উদ্ধৃত অংশ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' 'জলধর' শীর্ষক একটি কবিতা আছে; তাহারই অনুসরণ করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল !
লতায় কুসুম দলে, পাতায় সরসী জলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল,
মরাল আনন্দ মনে, ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল।
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বসন খোলে,
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করি উঠিল।
এ শোভা দেখা'ব কারে দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায়, সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল !

প্রেমের নৈরাশ্যজনিত বেদনার ভাব হেমচন্দ্র তাঁহার রচিত যে সকল গীতিকবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহ বিষয়ক কবিতাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র

ঊনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যে প্রেমের কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ দিলে সর্বত্রই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'রই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারা যায়। 'কাব্যমালা' রচয়িতা বলদেব পালিত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'বিচ্ছেদ' নামক কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'রই বিরহ বিষয়ের প্রতিধ্বনি—

সাধের পিরিতে সই ঘটিল বিষাদ,
তীরেতে লাগিয়া হায় ডুবিল তরণী;
গ্রাসিল আসিয়া রাহু পুর্ণিমার চাঁদ;
ঝড়েতে ফলন্ত তরু ভাঙিল, সজনি;
যে শুক পাখীরে পাতি প্রণয়ের ফাঁদ,
প্রাণপণে ধরিলাম ক্লেশ তুচ্ছ গণি,
মাস পুর্ণ না হইতে বিধি সাধি বাদ
উড়াইয়া দিল তারে প্রবাসে অমনি!
সে বিনা আঁধার দেখি এ মহী-মণ্ডল,
সে গেল চলিয়া কেন গেল না জীবন?
মনোরথ সব মম হইল বিফল,
বিফল হইল হায়! এ নব যৌবন,
বৃথা কেন করি আর আশার সম্বল?
আর কি পাইব সেই প্রাণাধিক ধন!

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা-পুস্তকে' 'আকাঙ্ক্ষা' নামক কবিতাটিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব ও ভাষা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ইহাতে লিখিয়াছেন,

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্লভ!
কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি
শুইতাম শুনিবারে তোর মৃদুরব॥
রে প্রাণবল্লভ!

কেন না হইলি তুই, যমুনা-তরঙ্গ,
মোর শ্যামধন !
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর নৃত্য দরশন ॥
ওহে শ্যামধন !

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মহাকাব্যের কবি পূর্বোক্ত কেবল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে নহে, অন্যতম কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যের মধ্যেও মধুসূদনের গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার 'হৃদয়-উচ্ছ্বাস' কবিতায় লিখিয়াছেন,

সখি রে !
আর কি বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে।
দিন দিন পল পল জ্বলিছে বিরহানল,
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে।
প্রিয় সখি, মরিতেছি মরমে।

আরও পরবর্তী কালে আসিয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'বিরহ' কবিতায় অভিন্ন সুরই শুনিতে পাই—

সখি, তেমনি শাঙন নিশি, চমকিত দিশি দিশি,
মুহু মুহু ক্ষীণ হাসি চপলা বালার ;
মৃদু মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন,
বিকট বজর-নাদ চমক হিয়ার—
এমনি যামিনী ঘনে, বেঢ়ি তুয়া সখী সনে,
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার !
সেই বাঁশী সেই গান গানে সে রাধার নাম,
শিহরিত দেহ প্রাণ চমক আমার !
সেই মেঘ গুরু গুরু, হিয়ার কাঁপুনি গুরু,
কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার ;—
মনে পড়ে, ললিতেরে, সে'দিন আবার !

সেই বৃন্দাবন এই,
এই ত কালিন্দী সেই,
সেই কি রাধিকা এই ? বল একবার,
কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে রাধার ?
কেন তবে বিরহের অকূল আঁধার ?

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমগ্র বিরহ-কাব্য এই ভাবে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ রচিত এই শ্রেণীর পদগুলির মধ্যেও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সুর শুনিতে পাওয়া যায়—

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই॥
বিকচ বকুল ফুল, দেখে যে হ'তেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়,
এ নহে কি বৃন্দাবন ? কোথা সেই চন্দ্রাসন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বনপথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি', পীত-ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরাণ মজিল, সই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই॥

উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্র বাদ দিয়া যদি সে যুগের সাহিত্যের অন্যান্য রূপের মধ্যেও অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র যে প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। এক কথায় যদি এমন বলা হয় যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে সকল পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের বিষয় কিংবা কৃষ্ণভক্তি যাহারই অবলম্বন হইয়াছে, তাহারই প্রেরণা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' হইতেই আসিয়াছে—এই প্রেরণা কেবলমাত্র

অন্তর্মুখী ছিল না, বহির্মুখীও ছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে কৃষ্ণবিরহ-কাতর চৈতন্যদেবের যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধা চরিত্রেরই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—

হে শ্যামা, যমুনা, পুলিনে তোমার—
মুরলিমোহন বাজাত বাঁশী,
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি,
উথলিত তব লহর রাশি।
বিরহ-বিধুরা আসি ব্রজবালা
মনেরি' বেদনা জানা'ত তোরে,
জানতো সজনি ব'লে দেহ মোরে
কোথা গেলে পাব সে চিত-চোরে।

ইহার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 'কুসুম' নামক কবিতাটির ভাব, ছন্দ ভাষা ও রসগত ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য—

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি,
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী,
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?
আর কি পরিবে, কভু ফুলহার
ব্রজ-কামিনী ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার
বনশোভিনী ?

তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গিরিশচন্দ্রে যে ভাব-গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে, মধুসূদনে তাহা নাই ; ইহার কারণ, গিরিশচন্দ্রের নিজের মধ্যে যে ভক্তির ভাব ছিল, মধুসূদনের মধ্যে তাহার অভাব ছিল।

৮

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'

১৮৬১ সনে মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়, ১৮৮৪ সনে বৈষ্ণব কবিতার বিষয় অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশ হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ১৮টি গীতিকবিতার সমষ্টি, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ২১টি পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব আকারের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা নিতান্ত সামান্য। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদনের পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি, কিন্তু 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের অপরিণত প্রতিভার প্রয়াস। বিশেষতঃ মধুসূদনের প্রতিভা মহাকাব্যের রসাশ্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গীতিকাব্যের রসাশ্রয়ী—উভয়ের শিল্প ও রস-চেতনা অভিন্ন নহে। সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রবীন্দ্রনাথের পদাবলীগুলি রচনা করিবার সুযোগ ছিল; কিন্তু তিনি তাহার কতদূর সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন, কিংবা মধুসূদনের নিকট এই বিষয়ে তাঁহার কোন ঋণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

১৮৮১ সনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য রচনা করেন, ইহার মাত্র তিন বৎসর পর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ইহা তখনও পরানুকরণের যুগ, নিজস্ব মৌলিক প্রতিভার স্বাধীন সৃষ্টি তখনও তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই পটভূমিকায় যদি বিচার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও পরানুকরণের প্রভাব বশতঃই রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অনুকরণ কাহার? বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের রচনার অনুকরণ, না মধুসূদন রচিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র অনুকরণ?

ইহা বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুকরণ বলিয়া মনে হইবার কারণ এই যে, ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তাহা হয় নাই। কিন্তু ইহাই কি বৈষ্ণব পদাবলীকে অনুকরণ করিবার একমাত্র যুক্তি হইতে পারে? তাহা যে নহে, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তথাপি মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রচনা হইতেই সে যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিষয় রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের আর কোন বৈষ্ণব পদাবলী সম্মত বিষয় ইহাতে নাই। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও রাধার বিরহ দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে, বিরহ দিয়াই শেষ হইয়াছে; কিন্তু মধ্যভাগে মিলন, বংশীধ্বনি, বর্ষা, অভিসার প্রভৃতি বিষয়ক কতকগুলি পদও তাহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রথমাংশে ও শেষাংশে বিরহ বিষয়ক যে পদগুলি আছে, ইহাদিগকে এক সঙ্গে ধরিয়া লইয়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে বিরহ বিষয়ক পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। বিশেষতঃ ইহার মধ্যস্থ মিলন, বংশীধ্বনি কিংবা অভিসারের পদগুলির মধ্য দিয়াও রসোল্লাসের পরিবর্তে অতৃপ্তির একটি সুর ধরা দিয়াছে। সুতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' রাধা-বিরহের সঙ্গে ইহার ভাবগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষার অনুকরণে রচিত, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব কবিতার নিজস্ব ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলির অনুকরণে রচিত। উভয় ক্ষেত্রেই অনুকরণ এবং তাহার ভিতর দিয়া একের মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষার মৌলিক রস, তেমনই অন্যের মধ্যেও বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা ব্রজবুলির মৌলিক রস ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই; 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষা আনুপূর্বিক যেমন ব্রজবুলিও নহে, তেমনই আনুপূর্বিক বাংলাও নহে—ইহা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব গীতিভাষার একটি বিশেষ রূপ। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই এই কথা আরও স্পষ্ট হইবে—

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।

ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ-জাত বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্র রচনা ; সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিতার রস ও বাংলা কবিতার ধ্বনি কিছুই অবিমিশ্র ভাবে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র কাব্যভাষা ইহা হইতে বলিষ্ঠ ও সংহত ; কারণ, ইহাতে কেবলমাত্র একটি সমুচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা হইয়াছে, ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও গৌড়ীয় ভক্তি না থাকিলেও, ইহার কাব্যদেহে যে লাবণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে রস-নিবিড়তার অভাব হয় নাই। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভাষার মধ্যে পরিণত প্রতিভার স্পর্শ এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষায় অপটু হস্তের রচনার চিহ্ন রহিয়াছে। মধুসূদন যেমন ভারতচন্দ্রের সার্থক অনুকরণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার তেমন সার্থক অনুকরণ পারিতে পারেন নাই। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পাঠ করিয়া এই কথা মনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন রচিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াও এই কথা ভাবিয়াছিলেন যে, 'ব্রজাঙ্গনা'র ভাষা ও ছন্দ অনুসরণ না করিয়া মূল ব্রবুজলি ভাষাতেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিবেন—'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' হইতে যে ইহা স্বতন্ত্র মাত্র হইবে, তাহাই নহে—ইহার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর রসাবেদন সার্থক হইবে। কিন্তু মধুসূদন রচনা-রীতিতে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনায় যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ না করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া দুইশত বৎসর পিছাইয়া যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের ধারা তাঁহার পরবর্তী শক্তিশালী কবি মধুসূদনের মধ্য দিয়া স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ

করিয়াছিল, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা ভারতচন্দ্র, মধুসূদনকে অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের রসচিত্ত যেমন ইহাতে আত্মকেন্দ্রিক ও একান্ত রোমান্টিক ভাবাপন্ন, তাঁহার কাব্যদেহও এখানে স্বকীয় রস-চেতনায় তাঁহার নিজস্ব আঙ্গিক দ্বারা সৃষ্ট—বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ইহাতে সর্বত্র ব্যবহার করা হয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সে যুগের অন্যান্য কবিতার মত ইহাও তাঁহার রোমান্টিক চেতনার সূত্রে বিধৃত, ইহা তাঁহার সমগ্র কাব্যসাধনার সঙ্গে অখণ্ডভাবে যুক্ত। কিন্তু মধুসূদনের তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার ভিতর দিয়া যে ক্রমবিকাশের ধারার একটি অখণ্ডতা আছে, মধুসূদনের তাহা নাই। সুতরাং বহির্মুখী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সঙ্গে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র যে ঐক্যই থাকুক না কেন, অন্তর্মুখী ভাব-চেতনায় ইহা যেমন বৈষ্ণব পদাবলীও নহে, তেমনই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও নহে—সেইখানে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কোন কোন কবিতায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কবিতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' 'বংশীধ্বনি' নামক কবিতায় আছে—

> কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
> মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
> নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
> দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে ?

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র এই কবিতাটিতে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

> রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
> কঁহা শিখলি রে কান ?
> হানে থির থির মরম অবশকর
> লহু লহু মধুময় বাণ ॥

এই প্রকার আরও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

৯

কাব্যরূপ ও কাব্যভাষা

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম আধুনিক গীতিকবিতার ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। মধ্যযুগ ব্যাপিয়া পয়ার ও ত্রিপদীর যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, একদিকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ স্বীকার করিয়া, অন্যদিকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বশতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আসিয়া তাহার মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যথার্থ প্রাণস্ফূর্তির অভাব ছিল; ইহার কারণ, সেইদিন প্রধানতঃ সংস্কৃত ছন্দকে অনুকরণ করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ভারতচন্দ্র অবশ্য দুই দিক হইতেই বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সংস্কৃত ছন্দকে অনুকরণ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ দেশীয় প্রচলিত ছন্দগুলিকে স্বকীয় রসচেতনা দ্বারা পুনর্গঠিত করিয়া। তাঁহার দেশীয় প্রচলিত ছন্দগুলির পুনর্গঠনের প্রয়াস যত সার্থকই হউক, তাঁহার সংস্কৃতের অনুকরণ জাত সৃষ্টিগুলি যে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও প্রাণহীন হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁহার শিষ্য রঙ্গলাল এই বিষয়ে দেশীয় প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন; এমন কি, ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ জাত রচনা দ্বারাও তাঁহারা প্রভাবিত হন নাই। মধুসূদন কেবল মাত্র বাংলা কাব্যের আত্মায় নহে, ইহার দেহের মধ্যেও নূতন রস ও রূপ সৃষ্টি করিলেন—আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁহার প্রয়াসই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম। তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে যেমন পয়ারের বহিরঙ্গ অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের পদ রচনা করিয়াও ইহার অন্তরঙ্গে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও দৃশ্যতঃ ত্রিপদী ও পয়ারের বহিরঙ্গগত লক্ষণকে বহুলাংশে রক্ষা করিয়া অন্তরের দিক হইতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মধুসূদনের পরবর্তী গীতিকবিতার কবিগণ নানা ভাবে

তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিলেও বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ কিংবা তাহার ভাষা অনুসরণ করেন নাই। এই ক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করিবার কিছু কিছু প্রয়াস দেখা গেলেও প্রচলিত পয়ার ও দীর্ঘ এবং লঘু ত্রিপদীকে নূতনভাবে ভাঙ্গিয়া লইয়া বাংলা গীতিকবিতার বহিরঙ্গে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম কবিতাটির প্রথমাংশ এই—

নাচিছে কদম্ব মুলে, বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা-রমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।

ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর ৮×৮×১২ কিংবা ৬×৬×৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নহে, কিংবা ইহা আনুপূর্বিক দীর্ঘ ত্রিপদী কিংবা লঘু ত্রিপদীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দও নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীর একটি মিশ্র রচনা মাত্র। প্রথম পদে ইহা ৮×৮ অর্থাৎ দীর্ঘত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু দ্বিতীয় পদে ইহা ছয় অক্ষর দ্বারা লঘুত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অথচ ইহার মধ্য দিয়া একটি অপূর্ব গীতিসুর সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণই হউক, কিংবা মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণই হউক উনবিংশ শতাব্দীতে যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি এই পথে আদৌ অগ্রসর হন নাই; তিনি বাংলা ছন্দের প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিতর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য পাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ইহার নিজস্ব রূপটিকে উদ্ধার করিলেন। বাংলা ছন্দের রাজ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনই যে তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব তাহা নহে, তিনি গীতিকবিতার উপযোগী করিয়াও সেইদিন যে মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিলেন, তাহাও পরবর্তী কবি-সমাজের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

পয়ার, ত্রিপদী কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান

ত্রুটি ইহাদের সুরগত বৈচিত্র্যহীনতা অর্থাৎ একঘেয়েমি ; মধুসূদন পাঠ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, গান করিবার উদ্দেশ্যে নহে। সুতরাং একঘেয়েমি যে এই বিষয়ক রস সৃষ্টির অন্তরায়, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াই একই পংক্তির মধ্যেই তিনি সুর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু এই প্রয়াসের মধ্যেও তাঁহার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিবারই প্রবণতা দেখা যায়, কোনও মৌলিক রস সৃষ্টি করিবার প্রয়াসে জাতির রস-সংস্কারের ধারা হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন নাই। উপরি-উদ্ধৃত পদ কয়টির পরই একই পংক্তির মধ্যে তিনি লঘু ত্রিপদীর ছয় অক্ষর যুক্ত পদের পরিবর্তে এক একটি পূর্ণ পয়ারের পদ অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরের পদ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—

চাতকী আমি, সজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমন ধৈরয ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভাবি ও চরণ !

এখানে দেখা যাইতেছে, ত্রিপদীর বিভিন্ন পর্ব এবং পয়ারকে নানাভাবে সাজাইয়াই তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন— এই বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যলব্ধ তাহার কোন উগ্র বিজাতীয় রসবোধ তাহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই কাহিনী নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগরক্ষা করিবার এই প্রয়াস মধুসূদনের সাধনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটির মধ্যে চারি পদে পয়ার এবং একটি মাত্র পদে দীর্ঘ ত্রিপদীর অংশ যোগ করিয়া একটি নূতন ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, এইভাবেই আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস দেখা দিয়াছিল—

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী।

এই পংক্তিতে পয়ারের অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের চারিটি পদ থাকিলেও, পয়ারের অনুযায়ী পদে পদে মিল বা মিত্রাক্ষর নাই। পদে পদে মিল পয়ারের মধ্যে যে একঘেয়েমির সৃষ্টি করে, তাহা পরিহার করিবার জন্য তিনি প্রথম পদটির চারিটি পদ অতিক্রম করিয়া একেবারে পঞ্চম পদে গিয়া মিল দিয়াছেন, দ্বিতীয় পদের চতুর্থ পদের সঙ্গে মিল আছে, তৃতীয় পদটি দীর্ঘত্রিপদীর অনুযায়ী আট অক্ষরে মিল। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পয়ার ও ত্রিপদী পদে পদে এবং পর্বে পর্বে মিত্রাক্ষর সৃষ্টি করিয়া যে একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, মধুসূদন তাহা উপলব্ধি করিয়া পয়ার ত্রিপদীর বহিরঙ্গ পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কেবল মাত্র ইহাদের অন্তরগত সুর-পরিচয়ের মধ্যে এই বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন। তাহাতে আধুনিক কবিতায় নূতন সুরের আস্বাদ লাভ করিয়া বাঙ্গালী বিদগ্ধমন প্রথম পুলকিত হইয়া উঠিল।

বাংলা শব্দের ধ্বনি, রস ও মাধুর্য সম্পর্কে মধুসূদন যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার মধ্যে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা কবিতার চিরাচরিত মিলের অভাব পূর্ণ করিয়া মধুসূদন তাঁহার সেই রসবোধের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সেই রস-সচেতনতা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনাতেও সক্রিয় ছিল। ইহাতেও সরস অনুপ্রাস এবং রসব্যঞ্জক বিশেষ ধ্বনিযুক্ত শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখা যায়।

মধুসূদন ভারতচন্দ্রের মতই শব্দ-রসের কবি। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভক্তি-ভাবের অভাব বাংলা শব্দের সুনিপুণ শিল্প-প্রয়োগ দ্বারা অনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের ব্যবহার ব্যতীতও ইহাতে সর্বত্র যে শব্দগত ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহা পরম শ্রুতিসুখকর হইয়া উঠিয়াছে। সুমার্জিত রসোজ্জ্বল এই শ্রেণীর পদের প্রয়োগে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সর্বত্র সুমধুর—

> সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
> রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন!
> এ ছার সংসার আজি আঁধার, সজনি রে—
> রাধার নন্দনে!

ফুটিল বকুলফুল কেন গো গোকুলে আজি
কহ তা, সজনি ?

এই ভাষার গুণে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' অপরূপ রসমাধুর্য্য লাভ করিয়াছে, বাংলার গীতি-কবিমানস ইহার ভিতর দিয়া ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

এই সুললিত গীতি-কাব্যভাষার বহু নিদর্শন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

এখানে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কাব্যভাষার আর একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করা যায়। নিম্নোদ্ধৃত পদটি লক্ষ্য করা যাক্—

ওই শুন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন রে,
মুরারির বাঁশী !

অনেক সময় শব্দের অর্থগত তাৎপর্য বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির জন্য মধুসূদন তাঁহার কাব্যে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'মুরারি' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এখানে কেবল মাত্র 'ম' ধ্বনির অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, নতুবা এই শব্দটি এই পরিবেশে ব্যবহৃত হওয়া অসঙ্গত। কারণ, 'মুরারি' কথাটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য গুণের ভিত্তির উপর পরিকল্পিত। মধুসূদন কেবল মাত্র অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টির জন্যই এখানে শব্দের অর্থ এবং উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়েও মধুসূদনের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ঐক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বীরাঙ্গনা কাব্য

(১৮৬২)

১

ওভিদ ও মধুসূদন

আমরা সাধারণ ভাবে এই কথা সকলেই জানি যে, সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) 'বীর-পত্রাবলী'র (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। বিষয়টি বিস্তৃত কিংবা সংক্ষিপ্ত কোন দিক হইতেই আলোচনা না করিয়াই মধুসূদনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু এই কথাও দাবী করিয়াছেন যে, 'পত্রাকারে কাব্য রচনা যে সম্ভবপর, মধুসূদন তাহাই কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোনও স্থলে তাঁহার গ্রন্থের ভাবাপহরণ করেন নাই।' এই বিষয়টি গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য ; কারণ, ইহার মধ্যে মধুসূদনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য ওভিদের জীবন ও তাঁহার কাব্য সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রাচীন রোম নগরের প্রায় নব্বই মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সুল্‌মো (Sulmo) নামক শহরে খৃষ্টপূর্ব ৪৩ অব্দে মহাকবি ওভিদের জন্ম হয়। তাঁহার পুরা নাম পাব্‌লিয়াস্‌ ওভিডিয়াস্‌ নাসো (Publius Ovidius Naso)। সুল্‌মো নগর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, ইহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'Picturesquely situated among the mountains of the Abruzzi : its wealth of waters and natural beauties seem to have quickened

in him that appreciative eye for the beauties of nature which is one of the chief characteristics of his poems'. ওভিদের জন্মস্থানের 'wealth of water' এবং তাঁহার কাব্যজীবনে ইহার যে প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মধুসূদনের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ীর প্রান্তশায়ী কপোতাক্ষ নদ ও মধুসূদনের কাব্যজীবনে তাহার প্রভাবের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া মধুসূদনের পল্লী-প্রকৃতির প্রতি যে সুগভীর প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ওভিদের কাব্যজীবনে তাঁহার জন্মভূমির প্রকৃতির প্রভাবেরই যে অনুরূপ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ওভিদ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং আইন ব্যবসায় অবলম্বন করাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। রোম এবং এথেন্স সহরে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতেই আমোদপ্রিয় ও নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং ইহার আনুষঙ্গিক সকল দোষত্রুটিই তাঁহার চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রোম নগর ও তাঁহার জন্মভূমি উভয় স্থানেই তিনি আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি তিনবার বিবাহ করেন, প্রথম দুইটি বিবাহ অল্পদিনের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কেবলমাত্র শেষ বিবাহটিই জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের আট বৎসর পর তিনি তদানীন্তন রোম সম্রাট্ অগষ্টাস (Augastus) কর্তৃক রোম হইতে কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী তোমিস (Tomis—বর্তমান নাম Coustanza) নামক স্থানে নির্বাসিত হইলেন। তাঁহার প্রেম-বিষয়ক কবিতায় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবার জন্য তাঁহাকে এই নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। তিনি আর রোমে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই, নির্বাসন জীবনে ১৭ খৃষ্টাব্দে ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ প্রায় দশ বৎসর কাল তিনি নির্বাসনেই যাপন করেন।

গৌরবময় প্রাচীন রোমক সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বশেষ শক্তিশালী কবি। রোম সম্রাট্ অগষ্টাসের রাজত্বের শেষভাগে রোমক

সমাজের চিন্তাধারায় পূর্ববর্তী আলেকজেণ্ড্রীয় যুগের ঐতিহ্যের পুনরভ্যুত্থান দেখা গিয়াছিল, সমাজের নূতন চিন্তাধারাকে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠা করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ওভিদ এই ধারারই একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। সেই যুগে রোমক সাহিত্যে কাব্যই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল এবং গ্রীক্ পুরাণের কাহিনীই নানাভাবে কাব্যের উপজীব্য হইয়াছিল। বীরত্ব অপেক্ষা প্রেম বিষয়ই সেইদিন সমাজের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল, কিন্তু গ্রীক্ পুরাণের পটভূমিকা হইতেই প্রেমের বিষয়-বস্তুর সন্ধান করা হইত। পুরাণ হইতে প্রেমের কাহিনী সংগৃহীত হইলেও সেই যুগের রোমক কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ইহার উপর একটি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এই ভাবেই ক্লাসিকের কাব্যদেহে রোমান্টিক আত্মা সঞ্চারিত হইয়াছিল, অপ্রত্যক্ষ অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রকৃতির যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ওভিদ রোমক সাহিত্যের এই আদর্শের সর্বশেষ কবি।

এই কথাটি বিশেষ ভাবে বলিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহার সঙ্গে নানা দিক দিয়া মধুসূদনের বৈশিষ্ট্যেরও কতকগুলি ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াও প্রাচীন ভারতের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার প্রেরণা যে তিনি কোথায় লাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া মুখ্যতঃ প্রেমবিষয়কে অবলম্বন করিয়াও মধুসূদন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে যে তাঁহার দৃষ্টি সুদূর অতীত লোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিতই যে তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহাও মহাকবি ওভিদের জীবন ও সাধনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কাহিনীর উপর আধুনিক নিসর্গ-চেতনা সঞ্চারিত করিয়া কাব্যকে রোমান্টিকধর্মী করিয়া তুলিবার প্রেরণাও যে তিনি কোথায় লাভ করিয়াছেন, তাহাও ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে রোমক কবি ওভিদের

ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি বিষয়ে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহাও এই বিষয়ে উপেক্ষা করা যায় না। ইহা হইতে দেখা যায়, ইঁহাদের উভয়ের জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের আদর্শের মধ্যে বিশেষ কিছু অনৈক্য ছিল না। ওভিদের বিবাহিত জীবনের যে উল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে যে নৈরাশ্যের ভাব থাকিবার কথা, তাহাই তাঁহার প্রেম-বিষয়ক কবিতা রচনার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে, মধুসূদনেরও প্রথম জীবনে বিবাহের দিক দিয়া পর পর যে দুইবার নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল, তাহাও তাঁহার কাব্যসৃষ্টির মূলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ওভিদ যেমন পর পর দুইটি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পর তৃতীয় বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই মধুসূদনকেও আঁরিয়েতাকে বিবাহ করিবার পূর্বে দুইবারই বিবাহ বিষয়ে নৈরাশ্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমবার কলিকাতার এক বাঙ্গালী খৃষ্টান পরিবারে বিবাহ করিতে অভিলাস করিয়া সেখানে নিরাশ হন, দ্বিতীয় বার রেবেকার সঙ্গে বিবাহও তাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—এই বিষয়টি তাঁহার প্রেম-বিষয়ক কবিতার উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মহাকবি ওভিদের জীবনেও ঐ কথাই সত্য হইয়াছিল। সুতরাং ওভিদকে যে মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার ভিতর দিয়া কেবল বাহির হইতেই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—অন্তরের দিক দিয়াও ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্যকে আধুনিক চিন্তাধারায় নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া যেমন মহাকবি ওভিদ ইউরোপীয় সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, মধুসূদনও তেমনই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের উপযোগী করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। মহাকবি ওভিদ যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রাচীন ও ইহার পরবর্তী যুগের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছেন, মধুসূদনও তেমনই সর্বপ্রথম কবি, যিনি ভারতীয় প্রাচীন বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার যোগ স্থাপন করিয়াছেন। মধুসূদনের পর

হইতেই বিহারীলালকে লইয়া বাংলা গীতিকবিতার যে যুগ সৃষ্টি হইল, তাহার মধ্যে অনুভূতির যে গভীরতাই থাকুক না কেন, ভারতের বিরাট ঐতিহ্যময় জীবনের পটভূমিকা সেখান হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই দিক দিয়াও মধুসূদনের সঙ্গে রোমক কবি ওভিদের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি, ইতালীয় নবজাগরণের যুগেও মহাকবি ওভিদের কাব্যই ইতালীয় সাহিত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি, ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগেও তাঁহার প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যের নানা দিক দিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ওভিদের রচনার ভিতর দিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আধুনিক কালে প্রাচীন রোম ও গ্রীসের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, ওভিদের সৃষ্টি-চেতনার মধ্যে একদিক দিয়া জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনতর ধারার সঙ্গে যে রকম যোগ দেখা যায়, তেমনই আধুনিকতম রোমান্টিক-চেতনার উন্মেষ দেখা যায়। এই উভয়ের সমন্বয়ে তাঁহার কাব্য এক বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়াছে।

মধুসূদনের মধ্যেও বহুলাংশেই ওভিদের এই দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম যেমন একসূত্রে বিধৃত, ওভিদেরও অনেকটা তাহাই। প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বপ্ন-দর্শনের দিক দিয়াও উভয়েই সমধর্মী, প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধানেও উভয়ের মধ্যে যে রস-চেতনার বিকাশ দেখা যায়, তাহাও বহুলাংশে অভিন্ন। সুতরাং মধুসূদন অতি সহজেই ওভিদকে অনুসরণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদন অন্ধ অনুকারক মাত্র ছিলেন না, তাঁহার যে জীবন-চেতনা ছিল, তাহা ওভিদের সঙ্গে বহুলাংশে অভিন্ন হইলেও তাহা বহির্মুখী অনুকরণ-জাত নহে—বরং অন্তর্মুখী মানস-গঠনের ঐক্য হইতেই সম্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ মধুসূদনের স্বাঙ্গীকরণের একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। প্রাচীন বিষয়-বস্তুকে যুগ-চেতনা দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তাহাতে নূতন প্রাণ-সঞ্চার

করিবার যে তাঁহার একটি দুর্লভ প্রতিভা ছিল, তাহা দ্বারাই তাঁহার রচনার বাহিরে ও অন্তরে একটি স্বকীয়তা দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' আমরা তাহারই পরিচয় পাইব। এখানে ওভিদ যত বড় কবিই হউন, তাঁহাকে অনুকরণ মাত্র করিয়া নহে, তাঁহাকে স্বাঙ্গীকরণ করিয়া মধুসূদনের নূতন সৃষ্টির বৈভব রচনারই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারিব।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু ঐক্য না থাকিলেও দুইটি বিষয়ের মধ্যে স্বাঙ্গীকরণ সম্ভব হয় না। প্রাচীন ইতালী ও ভারতের জাতীয় সংস্কারে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য ছিল। বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী নিয়তিবাদী প্রাচীন ইতালীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ধর্ম ও জীবন-বিশ্বাসে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহার মধ্য দিয়া মধুসূদন ইতালীয় কবি ওভিদের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করিয়াছেন। শিক্ষায় দীক্ষায় ধ্যান-ধারণায় দুই দেশের এই দুই কবির মধ্যে যে অভিন্ন মানস-পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' স্বাঙ্গীকরণের তাহাই ছিল ভিত্তি।

২

'হিরোইদ্‌স্' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য'

ওভিদের কাব্যকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে—প্রথমতঃ তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা প্রেম-বিষয়ক কাব্য, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মধ্য বয়সের রচনা পৌরাণিক বিষয়ক কাব্য এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার শেষ বয়সের বিলাপ (laments) শ্রেণীর রচনা বিষাদাত্মক কাব্য। ইহাদের মধ্যে তাঁহার 'হিরোইদ্‌স্' (*The Heroides* বা *Epistles of the Heroines*) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা এবং প্রেমই ইহার উপজীব্য। 'হিরোইদ্‌স্'-এ বীরের পত্নী কিংবা তাহাদের প্রেমিকদিগের কথা থাকিলেও তাহাদের বীরত্বের কোনও কথা নাই, বরং বীর-পত্নী কিংবা তাহাদের প্রণয়ীদিগের অন্তরের একান্ত প্রেমানুভূতিই ইহার একমাত্র উপজীব্য। মধুসূদনও এই অর্থেই তাঁহার কাব্যের নাম করিয়াছেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অন্ততঃ একটি পত্রিকার মধ্যে এক কাপুরুষ স্বামীর বীর-পত্নীর কথা আছে, তাহা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'; ইহার বিষয় পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। কিন্তু ওভিদের 'হিরোইদস্'-এর মধ্যে এই শ্রেণীর একটিও চরিত্র নাই—ইহা গীতিমধুর প্রণয়-কাব্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ওভিদের 'হিরোইদ্‌স্' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে পনরটি পত্র বা Epistles ছিল, ইহাদের প্রত্যেকটি প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমাস্পদের নিকট লিখিত। এই কাব্যখানি যখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিল, তখন ওভিদ ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া ইহা যখন দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিলেন, তখন ইহাতে আরও ছয়টি পত্র যোগ করিয়া দিলেন, তখন হইতেই ইহার পত্র সংখ্যা হইল একুশ। কিন্তু পরবর্তী যোজনা শেষ ছয়টি পত্রের একটু বিশেষত্ব ছিল, ইহারা প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত, অর্থাৎ প্রথমে প্রেমিক একখানি পত্র প্রেরণ

করিবার পর প্রেমিকাও তাহার একটি উত্তর দিতেছেন। এইভাবে শেষ ছয়টি পত্র তিনটি যুগ্ম-পত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। যেমন 'হিরোইদস্'-এর ষোড়শ পত্রটি হেলেনের প্রতি প্যারিস্ এবং সপ্তদশ পত্রটি তাহারই উত্তর স্বরূপ প্যারিসের প্রতি হেলেন কর্তৃক লিখিত। এই ভাবে অবশিষ্ট যুগ্ম পত্র দুইটিও হিরোর প্রতি লিয়েণ্ডার ও লিয়েণ্ডারের প্রতি হিরো এবং সাইদীপের প্রতি একন্‌টিয়স্ ও একন্‌টিয়সের প্রতি সাইদীপ কর্তৃক লিখিত। যদিও মধুসূদন একুশখানি পত্রিকা রচনা করিবার অভিলাস প্রকাশ করিয়াও মাত্র একাদশখানি পত্রিকাই তাহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ওভিদের দ্বিতীয় বারে রচিত যুগ্ম-পত্রের অনুকরণে কোন পত্র রচনা করেন নাই। তাঁহার অপ্রকাশিত যে আরও কয়েকটি পত্রিকা ছিল, তাহাদের মধ্যেও এই শ্রেণীর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন রোমক সাহিত্যে ওভিদই যে এই শ্রেণীর প্রেমবিষয়ক পত্র কাব্য রচনার ধারার প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, ওভিদের পূর্ববর্তী একজন রোমক কবি প্রোপারতিয়াস্ (Properties) এই শ্রেণীর পত্রকাব্য রচনার সূত্রপাত করেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। তবে ওভিদের সঙ্গে প্রোপারতিয়াসের পার্থক্য এই যে, প্রোপারতিয়াস্ তাঁহার সমসাময়িক সমাজের বিশিষ্ট কয়েকটি মহিলার চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার পত্রকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ওভিদ পুরাণের মধ্য হইতেই চরিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন; এই বিষয়ে মধুসূদন ওভিদেরই অনুসরণকারী, অন্য কাহারও তিনি অনুসরণ করেন নাই। তবে ওভিদ পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিলেও তাহাদের মধ্য হইতে নারীর শাশ্বতী বৃত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মধুসূদনকেও তাহা প্রেরণা দান করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন রোমক সভ্যতার একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, তাহাতে নারী উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাহাদের জীবন ছিল

ক্রীতদাসীর জীবনেরই অনুরূপ, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনসত্তা বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না—পুরুষ যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী রূপেই তাহাদিগকে ব্যবহার করিত। পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিলেও স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে এই ধারণাটি মনের মধ্যে রাখিয়াই মহাকবি ওভিদ তাঁহার *The Heroides* কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন যখন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাহারই অনুকরণে লিখিতে যান, তখন তিনি একদিক দিয়া স্ত্রীজাতির ভারতীয় গৌরবময় ঐতিহ্য ও অপর দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চিন্তায় ইংরেজি সাহিত্য ও সমাজের প্রভাব-জাত স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কিত নূতন মূল্যায়নের কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ হইতে তিনি যে চরিত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই যে বিশিষ্ট ঐতিহ্য ছিল, সেই ঐতিহ্য তিনি আনুপূর্বিক সর্বত্র অনুসরণ না করিলেও, এই কথা সত্য যে, তাহা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন রোমক সমাজে নারীর যে স্থান ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই ওভিদ তাহার কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলি রূপায়িত করিয়াছেন; কোন কোন ক্ষেত্রে ওভিদের এই প্রভাব মধুসূদনের উপর সক্রিয় হইয়া উঠিলেও, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে যে বিসর্জন দিয়াই তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। সুতরাং দেখা যায়, মধুসূদন একদিক দিয়া ওভিদ দ্বারা যেমন প্রভাবিত হইয়াছিলেন, আর একদিক দিয়া প্রাচীন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং এই দুই বহির্মুখী প্রভাবের উপর উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবোন্মেষিত নারীর মর্যাদাবোধও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পুনর্জাগরণের একটি প্রধান দিক ছিল, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি—বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা এই প্রেরণা হইতেই আসিয়াছে এবং ইহারই পথ ধরিয়া মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' প্রমীলা চরিত্রের পরিকল্পনা এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র ওভিদকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া

বাঙ্গালীর সমাজ-চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন নাই। বরং আধুনিক বাংলার সমাজে নারীত্বের মর্যাদাবোধ উন্মেষের পরম ক্ষণে যুগন্ধর কবি মধুসূদনের চেতনায় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র পরিকল্পনা দেখা দিয়াছিল। সেইজন্য ইহার মধ্যে অনুকরণের দৌর্বল্য নাই, বরং মৌলিক সৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

ওভিদ তাঁহার 'হিরোইদ্‌স্‌'-এর প্রথম প্রকাশ কালে যে পনরটি পত্রকাব্য রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে পাঁচখানি প্রোষিতভর্তৃকা কিংবা বিস্মৃতা ও পরিত্যক্তা পত্নী কর্তৃক পতির নিকট লিখিত। অবশিষ্ট পত্রগুলি প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমিকের নিকট লিখিত। প্রেমিকা সর্বত্রই কুমারী নহে, ইহাদের মধ্যে পরপুরুষাসক্তা বিবাহিতা নারীও আছে। এমন কি, পরপুরুষাসক্তি অনেক সময় নির্লজ্জ সমাজ-বিগর্হিত পরিচয়ও লাভ করিয়াছে; যেমন, হিপোলিটাসের প্রতি ফিড্রা (Phaedra to Hippolytus)-র পত্রে বিমাতা সপত্নী পুত্রের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং মাকারেয়াসের প্রতি কেনেসের পত্রে ভগ্নী ভ্রাতার প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এমন কি, যেখানে পতি-পত্নী কিংবা নির্দোষ কুমারী প্রেমের কথাও আছে, সেখানেও ওভিদের রচনায় প্রাচীন রোমক জাতিসুলভ নারীচরিত্র সম্পর্কিত বিশিষ্ট ধারণা কোথাও একটুও গোপন হইয়া থাকিতে পারে নাই। নারী সম্পর্কিত প্রাচীন রোমক জাতির এই বিশিষ্ট ধারণার পটভূমিকায় যখন উক্ত দুইটি সমাজ-বিগর্হিত প্রেম-পত্রিকা পাঠ করা যায়, তখন তাহাদের নির্লজ্জতা পাঠক মনকে আকস্মিকভাবে আঘাত করিতে পারে না—মনে হয়, একটি সমাজের স্বাভাবিক জীবন-সূত্রেই যেন তাহা আসিয়াছে। সমসাময়িক কালে মিশর দেশে রাজপরিবারে ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ প্রচলিত ছিল, বহুপত্নীক রাজাদিগের পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না এবং সকল পুত্রের সঙ্গেই পারিবারিক সম্পর্ক সুনিবিড় হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতে পারে নাই। প্রাচীন মিশরের সঙ্গে প্রাচীন রোম'ও গ্রীসের নানাভাবেই সেদিন সামাজিক বা পারিবারিক

সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই দুই দেশেরও সামাজিক আদর্শ যে মিশর হইতে উন্নত ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। সুতরাং ওভিদের মধ্যে এই সকল পরিকল্পনা একটি প্রত্যক্ষ সমাজের স্বাভাবিক জীবন-ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে।

মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' যে একাদশটি পত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সাতটি বিভিন্ন অবস্থায় পত্নী কর্তৃক পতির নিকট লিখিত, দুইটি সমাজ-বিগর্হিত প্রেমবিষয়ক—প্রকৃতপক্ষে ইহাদের একটির মধ্যেই নারীহৃদয়ের এই প্রেম নিতান্ত দুঃসাহসিক এবং নির্লজ্জ পরিচয় ধারণ করিয়াছে, অন্যটির ক্ষেত্রে তাহা তত নির্লজ্জ হইতে পারে নাই—একটিতে বীরাঙ্গনার প্রেম ও অবশিষ্ট আর একটিতে কুমারীর সাত্ত্বিক প্রেম-নিবেদনের কথা আছে। সুতরাং দেখা যায়, মধুসূদনের সঙ্গে ওভিদের বিষয়-বস্তুর দিক দিয়াও যে কোনও স্থূল পার্থক্য আছে, তাহা নহে। এমন কি, ওভিদ তদানীন্তন রোমক সমাজে প্রচলিত নারী সম্পর্কিত ধারণার উপরও ভিত্তি করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিবার ফলে তাঁহার পরিকল্পিত স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে যে নৈতিক চারিত্র শক্তির অভাব দেখা দিয়াছে, ভারতীয় নারীত্বের একটি উচ্চতর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাব্য রচনা করা সত্ত্বেও মধুসূদনের রচনায় ওভিদের অনুকরণ-জাত এই ত্রুটিও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ ওভিদ প্রাচীন রোমক সাহিত্যে উচ্চতর নারী চরিত্রের আদর্শের সন্ধান না পাইলেও, মধুসূদনের পক্ষে ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ হইতে অতি সহজেই তাহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু তিনি ভারতীয় সাহিত্য হইতে ইহার কাহিনী অনুসন্ধান করিলেও ওভিদের দৃষ্টি দ্বারাই তাহাদিগকে বহুলাংশে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার ফলে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে ভারতীয় বীর চরিত্রগুলির 'অঙ্গনা'র কথা প্রকাশ পাইলেও, তাহাদের সহধর্মিণীর পরিচয় তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় যে, ভারতীয় বীর চরিত্রগুলি যেন প্রাচীন রোমক সমাজ হইতে তাহাদের বিদেশিনী পত্নীদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন—ইহার পুরুষ বীর চরিত্রগুলি ভারতীয়, কিন্তু তাহাদের পত্নীগণ বিদেশিনী-

প্রাচীন ইতালীয়। অথচ পুরুষ চরিত্রগুলি ইহাতে নেপথ্যে রহিয়াছে। কিন্তু এই যে ত্রুটি সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—ইহা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একটি সাধারণ ত্রুটি মাত্র।

মধুস্‌দন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য ভূমিকা সংযোগ করিয়া বিষয়টি পাঠকদিগকে প্রথমেই বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—ইহা দ্বারা এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ নাও পাইতে পারে বলিয়াই তিনি নিজেও আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ওভিদের মূল কাব্যে এই শ্রেণীর ভূমিকা নাই, বিনা ভূমিকাতেই তাঁহার প্রত্যেকটি পত্রকাব্যের সূত্রপাত হইয়াছে।

ওভিদের সমসাময়িক কালে গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক কাহিনী যে ইতালীর শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল, ইহাতে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মধুস্‌দন তাঁহার সমসাময়িক কালের ভারতীয় পুরাকাহিনীবিমুখ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে তাঁহার বিষয়গুলি পরিচিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই বিষয়ে কিন্তু মধুস্‌দন ওভিদের ইংরেজি অনুবাদকর্দিগেরই পথ অনুসরণ করিয়াছেন, নিজে কোন মৌলিক প্রয়াস করেন নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহর হইতে হেন্‌রি টি. রিলে কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ওভিদ রচিত *The Heroides or Epistles of the Heroines*-এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রত্যেকটি প্রেম-কাব্যের এক একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য ইংরেজি ভূমিকা প্রকাশিত হয়, তাহা ওভিদের অনুবাদ নহে, বরং মনে হয়, ইংরেজ গ্রন্থ-সম্পাদকের নিজস্ব যোজনা। সম্ভবত মধুস্‌দন অনুরূপ কোন পূর্ববর্তী ইংরেজি সংস্করণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভে এক একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য ভূমিকা সংযোগ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; যেমন 'হিরোইদ্‌স্'-এর প্রথম পত্রকাব্যটির বিষয় Penelope to Ulysses, ইহার উক্ত সংস্করণের ইংরেজি ভূমিকাটির প্রথমাংশে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে ঃ

The Trojan war having been caused by the perfidy of Paris, who carried off Helen, the wife of his host, Menelaus, King of Sparta, the Greeks, having in vain applied for redress, determined to revenge themselves by force of arms···ইত্যাদি।

মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি পত্রের ভূমিকায় অনুরূপ বিষয়-পরিচিতি দিয়াছেন, এই বিষয়ে তিনি মূল গ্রন্থের পরিবর্তে যে ইহার এই শ্রেণীর কোনও পরবর্তী ইংরেজি সংস্করণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, পদ্ধতিটি উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন, মূল ওভিদের রচনার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই।

প্রাচীন ইতালীয় ভাষায় মধুসূদনের অধিকার থাকিলেও তিনি তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনায় যে ওভিদের মূল কাব্যখানিতেই একমাত্র নির্ভর না করিয়া ইংরেজি অনুবাদেরও সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপরের দৃষ্টান্তটি তাহার প্রমাণ। অনেক সময় ওভিদের কাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের রচনার যে বিষয়, ভাব ও চিত্রগত ঐক্য দেখা যায়, তাহাও ওভিদের ইংরেজি অনুবাদের মধ্যস্থতায় আসা একেবারেই অসম্ভব নহে। এই প্রকার ঐক্যের দৃষ্টান্তও নিতান্ত অল্প নহে; এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ওভিদ 'থিয়েসের প্রতি অরিআদ্‌নে' পত্রকাব্যে একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদে পাওয়া যায়ঃ

Uncertain whether awake, and languid with sleep, half reclining, I moved my hands to clasp my Theseus. No Theseus was there, ; my hands I drew back, and again I stretched them forth ; and along the couch did I move my arms ; no one was there.

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম সর্গে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রিকায় মধুসূদনের রচনায় যেন ইহারই সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছেঃ

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া
মেলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!

অমনি পাসরি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে।

এই পত্রিকারই অন্যত্র ওভিদ লিখিয়াছেন :

Meanwhile, as I shouted 'Theseus'! along all the shore, the hollow rocks re-echoed with thy name ;

মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় অনুরূপ একটি চিত্র এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন :

ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিয়া তুমি,
নরেশ্বর, 'কোথা জনা ?' বলি ডাক যদি
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা' বলি।

ইউলিসিসের প্রতি পেনিলপি পত্রিকায় ওভিদ লিখিয়াছেন :

Thou hast, and long mayst thou have, a son, who, in his tender years, ought to have been trained to the virtues of his father.

ইহাতে আরও আছে যে, শকুন্তলা দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁহার প্রথম মিলনের পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন :

যে তরুর মূলে
গান্ধর্ব বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয় মনে দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ ধামে।

থিয়াসের প্রতি অরিআদ্‌নের পত্রেও অনুরূপ মিলন-শয্যার স্মৃতির কথা বর্ণিত আছে। তাহার বাংলা অনুবাদ এই…

'যে আবাস-শয্যায় আমরা উভয়েই একদিন একত্র মিলিত হয়েছিলাম, অথচ তারপর আর কোনদিন মিলিত হইনি, আমি বার বার এই শয্যার কাছে আসছি, কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করতে না পেরে, সেই শয্যাকেই স্পর্শ করছি।'

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' পত্রিকায় আছে :

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুলনা নন্দনে,
সিন্ধুপতি ; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে , পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে।

হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফেইড্রা পত্রিকায় ওভিদ লিখিয়াছেন ঃ

I do not disdain to entreat as a suppliant and with humility. Alas ! where are my pride and my lofty expressions now lying prostrate ? And long had I determined to struggle, and not to yield to criminality : if love could have admitted of any resolution. Vanquished, I entreat thee, and to thy knees do I extend my royal arms ; no one in love considers what is becoming. I am past shame, and modesty, flying, has deserted its standards. Grant pardon to me confessing it, and subdue thy obdurate feelings.

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকাটির সঙ্গে ওভিদের 'হিরোইদ্‌সে'র চতুর্থ পত্র 'হিপোলিটাসের প্রতি ফ্রেইডা'র তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই নীতি-ধর্ম-লজ্জা-ভয়কে জলাঞ্জলি দিয়া দৈহিক লালসা বৃত্তির চরিতার্থতার কথা আছে। মধুসূদন তারার পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে, ধর্ম লজ্জা ভয়ে।

ফ্রেইডারও তেমনি লিখিয়াছেন ঃ

আমার লজ্জা-সম্ভ্রম দূর হইযাছে।

মধুসূদনের তারা বলিতেছেন ঃ

পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে।

ওভিদের ফ্রেইডার অনুরূপ অবস্থায় বলিয়াছেন ঃ

আমি প্রেমে দগ্ধ হচ্ছি, দাবানল-দাহে স্তনে ক্ষতচিহ্ন দেখা দিযেছে।

তারা 'নয়ন-কাজলে' পত্রখানি লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

ক্রেইডারও বলিয়াছেন যে তিনিও চোখের জল মিশিয়ে তাঁর প্রার্থনা জানিয়েছেন।

'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রে কেকয়ী তাঁহার বিগত যৌবনের জন্য পরিতাপ করিয়া বলিয়াছেন :

নম্র শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধাহীন অধর ! লইল
লুটিয়া কাল, যৌবন ভাণ্ডার
অছিল রতন যত ;

'হিরোইদ্‌সে'র 'একিলিস-এর প্রতি ব্রিস্‌টিস্‌' (Bristeis) পত্রে একিলিস বলিতেছে :

'আমার দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য আর নেই।'

কেকয়ী দশরথের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন :

পূর্ব কথা এবে স্মরি, নরমণি।
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে
কি সত্য করিলা প্রভু ধর্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ?

'হিরোইদ্‌স্‌'-এর 'দেমোফুনের (Demophoon) প্রতি ফিলিসে'র (Phyllis) পত্রে ফিলিস অনুরূপ পরিবেশে দেমোফুনকে লিখিতেছে :

'যে প্রেমের বন্ধনে তুমি বদ্ধ ছিলে, প্রতিজ্ঞা তুমি গ্রহণ করিয়াছিলে, এখন তাহা কোথায় ?'

মধুসূদনের 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' পত্রে সূর্পণখা লক্ষ্মণকে লিখিতেছে :

ক্ষম অশ্রু চিহ্ন পত্রে আনন্দে বহিছে
অশ্রুধারা।

'হিরোইদ্‌সে'র 'একিলিস-এর প্রতি ব্রিস্‌টিস্‌' পত্রে ব্রিস্‌টিস্‌ লিখিতেছে :

'পত্রে যে সকল চিহ্ন দেখিতেছি, তাহা সকলই অশ্রুর চিহ্ন ; কিন্তু অশ্রুর চিহ্ন তুল্য গুরুত্বপূর্ণ বলে জানবে।'

মধুসূদনের 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী'র পত্রে ভানুমতী লিখিতেছে :

গতরাত্রে বসি একাকিনী
শয়ন মন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু ! সহসা নাথ পুরিল সৌরভে
দশ দিশ ; পূর্ণচন্দ্র আভা জিনি আভা
উজ্জলিল চারিদিক, দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা অতুল জগতে।

'হিরোইদ্‌সে'র ফেওনের (Phaon) প্রতি সেফো (Sappho) পত্রে সেফো তেমনই বলিতেছে ঃ

'আমার শ্রান্ত দেহ শয্যার উপর বিছিয়ে দিয়ে যখন আমি ক্রন্দন করছি তখন এক দেববালা আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল।'

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'হিরোইদ্‌সে'র সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যে সম্পর্কই থাকুক মধুসূদন বহুলাংশে তাঁহার কাব্যকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-রসে জারিত করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন প্রাচীন বা অতীত জীবনের পরিবেশের মধ্যেও আধুনিক জীবনের ভাব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সে প্রয়াস যে খুব ব্যাপক, তাহা বলিবার উপায় নাই।

৩

বীরাঙ্গনা কাব্য ও গীতিকবিতা

মহাকাব্যের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা আখ্যানমূলক রচনা, কিন্তু গীতিকাব্য আখ্যানমূলক রচনা নহে—ইহা একটি মাত্র ভাব বা 'আই-ডিয়া' অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকে। এই অন্তর্মুখী ভাবটুকু প্রকাশ করিবার জন্য যতটুকু বহির্মুখী বিষয়ের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র বিষয়ই গীতিকবিতার অবলম্বন হইয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত কিছু ইহাতে স্থান পাইলে গীতিকবিতার ভাবের প্রকাশ সহজ ও প্রত্যক্ষ না হইয়া অনেক সময় জটিল ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিবার আশঙ্কা থাকে। মহাকাব্যে যে অলঙ্কার ব্যবহার করিবার সুযোগ আছে, গীতিকাব্যে তাহা নাই। ভাবের প্রকাশ যত প্রত্যক্ষ হয়, গীতিকবিতা ততই আকর্ষণীয় হয়। মহাকাব্যের অনুকরণে যখন ইহাতে অলঙ্কার ব্যবহাবের বীতি প্রবল হইয়া উঠে, তখনই গীতিকবিতার ধারা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই বিষয়টি দেখা গিয়াছে। বৈষ্ণব গীতিকবিতার যখন এ'দেশে জন্ম হয়, তখন ইহার ভাষা নিরলঙ্কাব ও ভাব নিতান্ত সহজ ও মর্মস্পর্শী ছিল, কিন্তু ক্রমাগত যখন তাহার অনুশীলন হইতে লাগিল, তখন একদিক হইতে ইহার উপর কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা ও অপর দিক দিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব আসিয়া পড়িতে লাগিল—ইহাতেই ইহার স্বতঃস্ফূর্তির ধাবা রুদ্ধ হইয়া গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা লুপ্ত হইল।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার পটভূমিকায় মহাকাব্য রচনার একটি সংস্কার সক্রিয় ছিল এবং ইহার কাব্য-দেহের রূপায়ণেও সেই সংস্কার বিসর্জিত হইতে পারে নাই। ইহাতেও মহাকাব্যোচিত অলঙ্কার ও শব্দবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যাইবে; তথাপি গীতিকবিতা হিসাবে ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা আখ্যানমূলক (narrative) রচনা নহে, ভাবকেন্দ্রিক রচনা। ইহা সর্গবদ্ধ রচনা

হইলেও সর্গগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন—একটির সঙ্গে আর একটির কোন সম্পর্ক নাই এবং প্রত্যেকটি সর্গের মধ্যেও একটি মাত্র স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবের প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে ইহাদের মধ্য দিয়া গীতিকবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রেমই গীতিকবিতার মুখ্য বিষয়, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়াও নরনারীর প্রেমেরই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তুই একটির মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম আছে মাত্র। কিন্তু ব্যতিক্রমগুলি বিশ্লেষণ করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের ভিত্তিমূলে গৌণতঃ প্রেমের অনুভূতিই বর্তমান আছে, প্রেমের অধিকারই কখনও নায়িকাকে নায়কের প্রতি মুখরা কিংবা অভিমানিনী করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং প্রেমানুভূতির যে একটি সর্বজনীনত্ব আছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নারীচরিত্রগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত নহে এবং সেই সূত্রেই প্রায় তুই হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি মধুসূদনের সঙ্গে ইতালীয় কবি ওভিদ একাত্মতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আলোচনায় একটি কথা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইতালীয় কবি ওভিদ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি তাঁহার কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভে কোন ভূমিকা যোগ করেন নাই, পরবর্তী কালে তাঁহার গ্রন্থের যাঁহারা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার প্রতি সর্গের প্রারম্ভে একটি করিয়া ভূমিকা যোজনা করিয়াছেন। মধুসূদনও ওভিদের মূল গ্রন্থের পরিবর্তে পরবর্তী গ্রন্থ-সম্পাদকদিগের অনুকরণে তাঁহার কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভেই এক একটি ভূমিকা যোজনা করিয়াছেন। এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য মূলক। ওভিদ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন গ্রীক পুরাণের কাহিনী সমাজে এত জনপ্রিয় ছিল যে, তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তী কালে গ্রীক পুরাণের কাহিনী অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত হইয়া আসিবার সময়ই এই ভূমিকাগুলি রচিত হইয়াছিল, মধুসূদন এই ক্ষেত্রে ইংরেজ গ্রন্থ-সম্পাদকদিগেরই অনুকরণ করিয়াছেন। নতুবা ওভিদ

যেমন তাঁহার কাব্যের গদ্য ভূমিকা রচনার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই, মধুসূদনও তাহা করিতেন না। এই ভূমিকা দ্বারা বিভিন্ন পত্রিকাগুলির গীতিধর্মিতায় আঘাত লাগিয়াছে, এ কথা সত্য ; কারণ, ভূমিকাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই এক একটি আখ্যায়িকা (narration) আছে। সুতরাং এই ভূমিকা সর্গগুলির অন্তর্নিবিষ্ট হইলে ইহাদের মধ্যেও একটু আখ্যায়িকার প্রভাব আসিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, 'বীবাঙ্গনা কাব্যে'র প্রতিটি সর্গ এক একটি যেমন স্বাধীন কবিতা, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকটিরই উক্ত ভূমিকা নিরপেক্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিচয় আছে—ভূমিকাগুলি ইহাদেব মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, ইহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়াও প্রতিটি সর্গের বস আস্বাদন কিংবা অর্থ পবিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। যেমন প্রথম সর্গেব পরিচয়রূপে যদি 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' এই কথাগুলিই থাকে, তবেই যথেষ্ট ; ইহার বেশী আর কিছু ইহার সম্বন্ধে বলিবার প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ। গীতিকবিতার কোন ভূমিকার প্রয়োজন হয় না কারণ, ইহার বহির্মুখী কোন পবিচয় নাই ; ইহার মধ্যে কেবল অন্তর্মুখী অনুভূতিই আছে, এই অনুভূতি সর্বজনীন বলিয়াই পরিচাযিকা কিংবা ভূমিকা ব্যতীতই সর্বকাল এবং সর্বদেশের বিদগ্ধ মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যদি ইহার ভূমিকা ব্যতীত বুঝিতে না পারা যায়, তবে গীতিকবিতা হিসাবে ইহা ব্যর্থ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে তাহা হয় নাই। যাঁহারা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত নাও জানেন, তাঁহারাও যদি ইহার ভূমিকা পাঠ না করিয়াও ইহার রস আস্বাদন করিতে পারেন, তবেই গীতিকবিতা রূপে ইহা সার্থক। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে গীতিকবিতার এই দাবী যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'য় প্রণয়ের প্রথম আস্বাদকারিণী এক শাশ্বতী নারীর যৌবনের উচ্ছল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার গোপন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে ইহার কোন ভূমিকা পাঠ করিবার প্রয়োজন করে না—দুষ্মন্ত যে কে, তিনি হস্তিনাপুরে কিংবা কৌশম্বীতে রাজত্ব করিতেন,

শকুন্তলাই বা কে, তিনি বিশ্বামিত্রেরই কন্যা কিংবা কণ্বমুনিরই দুহিতা, তাহা জানিবার কিছুই প্রয়োজন করে না। ইহাই গীতিকবিতার একটি বিশিষ্ট গুণ, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এই গুণ হইতে বঞ্চিত নহে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ 'সোমের প্রতি তারা'র পত্রিকাটি সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। ইহার সম্পর্কে এই বিষয়টি বুঝিতে না পারিবার জন্যই ইহার নানা প্রকার অর্থ করিয়া কোন কোন রক্ষণশীল সমালোচক ইহার সম্পর্কে নৈতিক আপত্তির কথা তুলিয়াছেন। এখানে তারা হিন্দু পুরাণোক্ত দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী বলিয়া মনে করিবার কিছুই কারণ নাই। কারণ, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' যে পুরাণ নহে, গীতিকাব্য মাত্র সে সম্পর্কে ত কাহারও কোন সংশয় থাকিবার কথা নহে। ইহা যদি পুরাণ কিংবা ঐতিহ্যের অনুসরণকারিণী (traditional) কোন বচনা হইত, তবে ইহার সম্পর্কে এই আপত্তি উঠিতে পারিত। ইহা গীতি-কবিতার প্রেরণায় রচিত, দেবগুরু বৃহস্পতি কিংবা তাহার দাম্পত্য জীবনের কোন কথাই ইহাতে নাই। আভাসে কিংবা ইঙ্গিতে ইহার মধ্যে পৌরাণিক কোন কাহিনী প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রাচীন ইতালীর সামাজিক জীবনাশ্রিত নারীচরিত্রের যে পরিচয় মহাকবি ওভিদের রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই অনুসরণ করিয়া মধুসূদন ইহাতে এক দুর্দম লালসাময়ী নারীর মনোভাব ব্যক্ত বিয়াছেন। ইহার সঙ্গে প্রাচীন ইতালীয় সমাজের নারীচরিত্রেরই সম্পর্ক, প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক নারীচরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। এমন কি, কবি ওভিদ যেমন তাঁহার যুগের কাব্য রচনার একটি সাধারণ ধারা অনুসরণ করিয়াই তাঁহার কাব্যে প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক চরিত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, মধুসূদনও তাহারই অনুকরণে ভারতীয় পুরাণ হইতে কতকগুলি নাম ও তাহাদের কতকগুলি বহির্মুখী পরিচয় সংগ্রহ করিয়া-ছেন মাত্র, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভারতীয় পুরাণের আত্মাটি আনিয়া সংযোগ করেন নাই—সেইজন্য তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং যে সকল রক্ষণশীল সমালোচক 'তারার চরিত্রকে কলুষিত করিবার জন্য' মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহার সম্পর্কিত সর্গটি রচনা

করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন এবং মধুসূদনের উপর সেইজন্য দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনঃকল্পিত ছায়া মূর্তি দেখিয়াই চমকাইয়া উঠেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ইহা হিন্দু পৌরাণিক সোম কিংবা তারার কোন বৃত্তান্তই নহে—বিশিষ্ট একটি সমাজ রূপের প্রতিনিধি হইয়াও ইহারা চিরন্তন নরনারীর শাশ্বত জৈববৃত্তির প্রতিনিধি। ওভিদের যুগে ইতালীতেও ইহারা যেমন বর্তমান ছিল, মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশেও ইহারা তেমনই বর্তমান ছিল। ইহারা নির্বিশেষ মাত্র, কোন ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শেব গণ্ডীর মধ্যে ইহাদের কেহই সীমাবদ্ধ নহে। বিষয়টি এই দৃষ্টি দ্বারা আমরা বুঝিবার কোনদিন প্রয়াস করি নাই বলিয়াই ইহার সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার অন্ত নাই।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ভাষা কেবলমাত্র যে মধুসূদন রচিত গীতিকাব্য-ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, তাহাই নহে—ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য-ভাষার আদর্শস্থানীয় ভাষা। বাহিরের দিক হইতে ইহাতে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হইতে পারে যে, ইহা সম্ভবতঃ মহাকাব্যোচিত গুরুগম্ভীর ভাষায় রচিত। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দকে মধুসূদন সপ্তস্বরা বাঁশীর মত ব্যবহার করিয়াছেন; ইহাতে বীর, করুণ, বীভৎস বিভিন্ন রসের সার্থক সৃষ্টি করিয়াও মধুসূদন ইহা দ্বারা গীতিকবিতাসুলভ মধুর রস সৃষ্টিতে অধিকতর সার্থকতা দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এক সূত্রে গ্রথিত। মহাকাব্যেও যেমন মধুসূদনের বীররস প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, একান্ত প্রেম-বিষয়ক রচনা 'বীবাঙ্গনা কাব্যে'ও তাহা সম্ভব হয় নাই। একদিকে বিষয় গুণ অপর-দিকে মধুসূদনের স্বাভাবিক গীতিপ্রাণতা এই উভয়ের সংমিশ্রণে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিধর্মীর রচনা। ইহার মধ্যে আদর্শ গীতিকবিতার ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পদে পদে মিল না থাকিলেও ইহার মধ্যে যে গীতিসুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা কোন কালেরই বাংলা গীতিকবিতার অযোগ্য নহে। একটিমাত্র অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়—'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার উপসংহারে মধুসূদন লিখিয়াছেন ঃ

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে, কাঁদি খেদে! মরিয়া সরমে!
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু! ক্ষমিও দোষ দয়াসিন্ধু তুমি!

এই ভাষা সর্বকালেরই বাংলার উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার ভাষা, সরল অথচ গীতিধর্মীর ভাষায় অন্তরের সলজ্জ অনুভূতির সহজ অভিব্যক্তি এখানে যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন।

ভাষার গীতিকাব্যসুলভ সরলতা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একটি বিশিষ্ট গুণ। এমন কি, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্বত্র এই গুণ প্রকাশ পায় নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা পর্যন্ত মধুসূদনের কাব্যভাষার একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, রচনার দিক দিয়া 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র যে ত্রুটি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া গিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ইহা একটি বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার সর্বশেষ রচনা হইলেও, প্রথম হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা অনুসরণ করিয়া স্বাভাবিক পরিণতি পর্যন্ত তাঁহার যে রচনাটি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। কারণ, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার পূর্বে তাঁহার কাব্য-সাধনার মধ্যে একটি ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল; সেইজন্য ইহার আঙ্গিক, ভাব এবং রস তাঁহার পূর্ববর্তী রচনাগুলি হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র। মধুসূদনের মধ্যে যে স্বাভাবিক গীতিপ্রাণতার অস্তিত্ব ছিল, তাহা তাঁহার মহাকাব্য দুইখানির মধ্যে সহজ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, বারবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহারই সহজ স্ফূর্তির কোন অন্তরায় ছিল না; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র জগতে যখন গিয়া পৌঁছিলেন তখন তাঁহার মধ্যে মহাকাব্যের আর বিশেষ কোনও প্রেরণা অবশিষ্ট রহিল না। সেইজন্য রচনার দিক দিয়া গীতিকবিতারূপেই ইহা সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে।

মধুসূদনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন যে, "বীরাঙ্গনা কাব্যে" মধুসূদনের গম্ভীর ও কোমল ভাবের একত্র সম্মেলন হইয়াছে। এই কথাটি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। 'কোমল ভাব' বলিতে এখানে যে গীতিকবিতাসুলভ মনোভাব মনে করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই ভাবের যে অভাব নাই এবং প্রধানতঃ ইহা ইহারই উপর রচিত হইয়াছে, সে কথা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

তবে 'গম্ভীর ভাব' বলিতে এখানে কি মনে করা হইয়াছে, তাহাই দেখা যাক্। উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হাস্যচটুল কিংবা লঘু বিষয়ক কৌতুকাশ্রিত নহে, জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধিই উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের বিষয়; সুতরাং যে ভাব গম্ভীর, তাহা যে কেবলমাত্র মহাকাব্যেরই বহির্মুখী বিষয়, তাহা নহে—তাহা গীতিকবিতারও বিষয়। মহাকাব্যের বহির্মুখী বিস্তার গীতিকবিতায় নাই সত্য, কিন্তু অন্তর্মুখী গভীরতায়ই ইহার গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং গাম্ভীর্য ও কোমলতা উভয়ই গীতিকবিতারই গুণ এবং কেবলমাত্র গাম্ভীর্য মহাকাব্যের গুণ—কোমলতার স্থান মহাকাব্যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সুতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট গুণের সন্ধান পাওয়ার জন্যই মধুসূদনের জীবনীকার ইহাতে 'গম্ভীর' ও 'কোমল' ভাবের একত্র সমাবেশ অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ—তাহার মধ্যেও ভাবের গভীরতা এবং রচনার কোমলতা পাঠকের মনে গীতিসুরটি জাগাইয়া তুলে।

৪

কবি-মানস

গীতিকবিতার প্রধান ধর্ম এই যে, ইহাতে কবির নিজস্ব একটা সত্তা অতি সহজেই ধরা পড়ে, মহাকাব্যের মধ্যে তাহা গোপন হইয়া থাকে। প্রত্যেক গীতিকবিতার মধ্য দিয়াই কবির নিজস্ব একটি বক্তব্য বিষয় প্রকাশ পায়, বিষয়টি কবির নিজস্ব হইয়াও সর্বজনীন হইয়া উঠিবার জন্য ইহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হয়, নতুবা ইহা কবির জীবন-কথা মাত্রই হইত। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বহির্মুখী পরিচয়ে মহাকাব্য হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্য দিয়া মধুসূদনের কবি-মানসের বিশিষ্ট একটি পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই গুণে ইহা প্রাচীন মহাকাব্যের লক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইলেও সার্থক রোমান্টিক কাব্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যদি গীতিকাব্যধর্মী হইয়া থাকে, তবে ইহার মধ্য দিয়া মধুসূদনের বিশিষ্ট কবি-মানসের অভিব্যক্তি অস্পষ্ট হইয়া থাকিবার কথা নহে। সুতরাং তাহার পয়িচয় কি, তাহা এখানে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

নারীর মনোভাবই 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অবলম্বন। সুতরাং নারী সম্পর্কিত কবির বিশিষ্ট কোন নিজস্ব ধারণা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ একথা সকলেই জানেন, মধুসূদনের সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যে তাঁহার জননী-চরিত্রের প্রভাব বিশেষ সক্রিয় ছিল। তাঁহার জননীর প্রতি বিলাসী পিতার অবহেলার জন্যই তাঁহার পারিবারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানি দূর হইয়াছিল। তাহার ফলে পরবর্তী জীবনে তাঁহার সাহিত্য-চিন্তার মধ্যেও তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার উপর উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব প্রবুদ্ধ জাতীয় চেতনায় নারী যে ক্রমে একটি সম্মানিত স্থানের অধিকারী হইতে চলিয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে তাঁহার কবি-হৃদয় মুক্ত থাকিবার কথা ছিল না। সতীদাহ প্রথা নিবারণ,

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার ইত্যাদির ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ যে ভাবে অগ্রসর হইতেছিল, তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত মন ইহার প্রতি যে পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন থাকিবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাহারই ফলস্বরূপ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রমীলা, সীতা ও সরমা চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদনের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষাগত যে ঐক্যই দেখা যাক না কেন, 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র মধ্যেই মধুসূদন ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়াও নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্নিত করিয়াছেন। সেইজন্য 'মেঘনাদবধ কাব্যে' লহনা, খুল্লনা, চণ্ডী, মনসা, বিদ্যার পরিবর্তে প্রমীলা, সরমা ও সীতাকে পাইলাম। সীতা ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া আসিলেও প্রমীলা কিংবা সরমা বাংলা সাহিত্যে অভিনব রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের যুগে নারীজাতি সম্পর্কে তাঁহার যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল, প্রমীলা ও সরমার মধ্যে তাহারই প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং এ'কথা আশা করা কিছুই অস্বাভাবিক নহে যে, সেই যুগেই যখন মধুসূদন কেবলমাত্র নারীচরিত্র-ভিত্তিক আনুপূর্বিক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তখন তাহার মধ্যেও নারীবিষয়ক তাঁহার এই ধারণা ও বিশ্বাসই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাহাই হইয়াছে? 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে কি আমরা প্রমীলা, সরমা কিংবা সীতাকে পাইয়াছি? এই কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তাহা পাই নাই। অথচ 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পর মধুসূদনের নিকট তাহাই আশা করা নিতান্ত অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। নারী সম্পর্কিত যে শ্রদ্ধাবোধ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার প্রতি মধুসূদনের স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল, মধুসূদন একান্তভাবে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন নাই। ইহার মধ্যে সীতা, প্রমীলা কিংবা সরমা ত নাই-ই, এমন কি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী', 'কর্মদেবী' কিংবা 'শূরসুন্দরী'ও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত যে যুগ-চেতনার বিকাশ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যোগ খুব নিবিড় নহে। এই সম্পর্কে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র দুই একটি পত্রিকার কথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে। 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'-সর্গটির কথা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে যুগ-চেতনার অভাব নাই। লক্ষ্মীবাই'র বীরত্ব সেদিন এই দেশের সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহারই প্রেরণা এই সর্গ রচনায় কার্যকরী হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রমীলার অনুসরণও দেখা যায়। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। জনা চরিত্রে প্রমীলাব গৌরব প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ জননী ও সম্রাজ্ঞী জনা মহাভারতের কতকগুলি সর্বজন শ্রদ্ধেয় চরিত্র সম্পর্কে এমন অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাঁহার উপব হইতে পাঠকের সহানুভূতির ভাবও দূর হইয়া যায়। প্রমীলা তাঁহার বাক্য ও আচরণে রাজকুলোচিত মর্যাদা সর্বত্র রক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা আনুপূর্বিক অটুট রহিয়াছে। বরং এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধুসূদনের পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'জনা' নাটকের জনার চরিত্র যেভাবেই অঙ্কিত করুন, তাঁহার মধ্য দিয়া কোন হীনতা প্রকাশ করেন নাই। নারী চরিত্র সম্পর্কিত শ্রদ্ধার বিকাশ যে সমাজের মধ্যে সেদিন সম্ভব হইয়াছিল, তাহারই একটি বিশিষ্ট পৌরাণিক চরিত্রেব মুখে এই ভাষার ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ বিশেষ চরিত্রের প্রতিই যে অশ্রদ্ধার পরিচায়ক, তাহা নহে—সমগ্র নারী জাতি সম্পর্কেই অবিশ্বাসের পরিচায়ক। রাজমহিষী ও বীরপুত্র-প্রসবিনী প্রবীরের জননী জনা স্বামীর প্রতি তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

> নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
> পার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে,—এ কি ভ্রান্তি তব ?
> হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
> স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জুনে
> (কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
> নর-নারায়ণ জ্ঞানে ?

দ্বৈপায়ন ঋষি
পাষণ্ড-কীর্তন-গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! কবিল
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্মমতি!

* * * * *

তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী।
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া। ধিক্, হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজে নারী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, মধুসূদনের এই রচনায় তাহার কোন প্রকাশ দেখা যায় না। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলাও বীরাঙ্গনা, মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র জনাকেও তাঁহারই মত বীরাঙ্গনা রূপেই যদি চিত্রিত করিতে চাহিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অথচ ইহার কারণ কি?

এই কথা মনে হইতে পারে যে, মধুসূদন এখানে ইতালীয় কবি ওভিদকে অন্ধ ভাবে অনুসরণ করিবার জন্যই বুঝি বা ইহার মধ্যে যুগ-চেতনা কিংবা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ উভয়কেই অবহেলা করিয়াছেন। কিন্তু 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় তিনি ওভিদের কোন পত্রিকার অন্ধ অনুসরণ করেন নাই—কারণ, তাহাতে কোন বীর নারীচরিত্র নাই, তাহারা সকলেই প্রেমিকা। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' একমাত্র জনাই প্রেমিকা নহে, সে উচ্চ ক্ষাত্রনীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধা; অথচ মধুসূদন তাঁহার চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। জনা চরিত্র

প্রমীলার আদর্শে রচিত নহে। অথচ তাহার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ রূপায়িত করা অসম্ভব ছিল না। বরং প্রমীলা চরিত্র রচনা করিবার পর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

ইতালীয় কবি ওভিদের আদর্শ 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার সময় মধুসূদনের সম্মুখে থাকিলেও, তিনি সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল—এই কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর যুগচেতনার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজ-জীবনের দুস্তর বিরোধ ছিল—উভয়ের মধ্য দিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন সর্বদাই মধুসূদনের পক্ষে যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা নহে। কোন কোন সময় পুরাণের প্রভাবও তাঁহার কবি-মানস কিংবা যুগমানস উভয়কেই আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে ; এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জনার আত্মায় নবযুগের যে শক্তিই সঞ্চারিত হউক না কেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে তখনও প্রাচীন যুগের জীর্ণ সংস্কার কিছুতেই দূর হইতে পারে নাই। কিন্তু প্রমীলার আত্মায় যেমন নূতন যুগের শক্তি, তেমনই তাঁহার দৃষ্টির মধ্যেও সম্মুখের উদার নভোমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য ছিল। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই গুণ প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই কেবল মাত্র জনা কেন, কোন চরিত্রেই প্রমীলার শক্তি অনুভূত হয় না। বহিরঙ্গে যে ঐক্যই থাকুক, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' 'মেঘনাদবধ কাব্য' অনুসারী রচনা নহে, ইহার পরিকল্পনা ও চরিত্র রূপায়ণ উভয়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার কারণ, 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায় যে স্বাধীনতা তাঁহার ছিল, ওভিদকে অনুসরণ করিতে গিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহা তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহা পায় নাই। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মধুসূদন নারী সম্পর্কিত নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ করিবার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরিমিত পরিসরের মধ্যেও তিনি নারীর পায়ে যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিস্তৃততর পরিবেশের মধ্যেও তিনি সেই

সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদনের নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নহে। ইহার ভিতর দিয়া মধুসূদনের যুগচেতনা অপেক্ষা ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিবারই প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়, সেই ঐতিহ্য আনুপূর্বিক ভারতীয়ও নহে, বহুলাংশে প্রাচীন ইতালীয়। সেইজন্য ইহাতে স্বাঙ্গীকরণ ও সমন্বয়ের অভাবও অপরিহার্য হইয়াছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাঠ করিলে দেখা যায়, মধুসূদন সীতাচরিত্রটির সম্পর্কে সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করিতেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' বিভিন্ন সর্গে বিশেষত চতুর্থ সর্গে 'সীতা ও সরমা'র কথোপকথনের ভিতর দিয়া সীতার প্রতি মধুসূদন যে সুগভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাহারও দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারে না। তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সীতাদেবী নামক কবিতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন :

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষু হতে অশ্রুধারা ঘনে।
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথা
দেবর লক্ষণ, দেবি, চিরজয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে।
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে :
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বনা করে,
মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে!
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে।

নারীর এই পরিচয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' নাই। ইহার মধ্য দিয়া সীতাচরিত্রের প্রতি কবি-হৃদয়ের যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা

ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়াও যুগাশ্রয়ী, প্রমীলা কিংবা সরমার মধ্যে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা না হইলেও যুগচেতনা তাঁহাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই শ্রেণীর নারী-চরিত্রের একান্ত অভাব দেখা যায়।

শকুন্তলার জীবনের দুইটি অধ্যায়, একটি কণ্বমুণির আশ্রমে তাঁহার জীবন, দ্বিতীয় মারীচের আশ্রমে তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবনের এই দুইটি অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে শকুন্তলা চরিত্রের যে মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সীতা চরিত্রের অনুরূপ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুসূদন তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায়টিকে উপজীব্য করিয়া তাঁহাকে সাধারণ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিলেন না। সীতার মধ্যে যে মহিমার সন্ধান পাইয়াছিলেন, শকুন্তলাব মধ্য হইতে তাহা সন্ধান করিয়া লইলেন না। একদিক দিয়া ইতালীয় কবি ওভিদের আদর্শ এবং অন্যদিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্য অনুসরণই যে ইহার কারণ, তাহা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। বহির্মুখী এই সকল প্রভাবের ফলে তাঁহার ব্যক্তি-চেতনা যে এখানে সম্পূর্ণ সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাই ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

৫

যুগ-চেতনা

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে এই কথা বুঝিতে পারা গেল যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' যেমন মধুসূদনের সকল বিষয়ক প্রতিনিধি-মূলক রচনা, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাহা নহে; ইহাতে মধুসূদনের ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীন ও স্বাভাবিক স্ফূর্তির যে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগ্রত সমাজ সম্পর্কিত মনোভাব পরিপূর্ণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ইহা প্রধানত অনুকরণজাত রচনা, রচনার যে বহির্মুখী গুণই ইহার মধ্যে প্রকাশ পাক, ইহার অন্তরাত্মায় সেই শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তথাপি এই কথা কি সত্য যে, ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নব প্রবুদ্ধ বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার কোন যোগ নাই? বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রেম-বিষয়ক রচনা; প্রেমের বিষয় একান্তভাবে একটি যুগকেই সুদৃঢ় বন্ধনে আশ্রয় করে না—ইহা শাশ্বত এবং যুগোত্তীর্ণ হওয়াই ইহার ধর্ম। প্রমীলার চরিত্রে প্রেমই একমাত্র পরিচয় ছিল না, কিংবা সেই পরিচয়ের মধ্যে যুগচিহ্নও কিছুমাত্র নাই। তাঁহার উচ্চ আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান গুণ, তাহাই প্রধানত তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে। নারীসমাজেও সেদিন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে অধিকার এই দেশের নূতন সমাজ স্বীকার করিতেছিল, তাহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে এই চরিত্রটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাগণ প্রত্যেকেই প্রণয়াস্পদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। 'জনা' যে ইহার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার কারণ, জনার প্রেমিকা-সত্তার কোন পরিচয় ইহাতে নাই। সেইজন্যই জনা বিশিষ্টা। জনা ব্যতীত আর সকল চরিত্রই প্রেমিকা; তাঁহাদের

প্রেমের পরিচয় প্রমীলার মত বীর্য ও বিক্রমের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে প্রেমিকাদিগের নির্বিচার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। নারীচরিত্রের কেবলমাত্র ইহা একটি বিশেষ যুগের কথা নহে, ইহা সর্বকালের কথা; সেইজন্যই বিশেষ একটি যুগ আশ্রয় না করিয়া ইহা সকল যুগই আশ্রয় করিয়াছে। বিশেষত এই প্রেমের সম্মুখে কোন উচ্চ আদর্শও নাই, যদি বিশেষ কোন উচ্চ আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে যুগচিহ্ন ধরা পড়িত। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাদিগের প্রেম দেহোত্তীর্ণ প্রেম নহে, নিতান্ত দেহাশ্রয়ী প্রেম—রূপ যৌবনের অঞ্জলি দিয়াই প্রেমিকাগণ প্রেমিককে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে, কোন দুঃখোত্তীর্ণ তপঃসিদ্ধি দ্বারা নহে। সুতরাং ইহা যেমন আদিম, তেমনই শাশ্বত প্রেম। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া বিশিষ্ট যুগ-চেতনার অভিব্যক্তি সম্ভব হয় নাই। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার মধ্যে এমন কথা কেহই দাবী করিতে পারিবেন না যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সমাজ-জীবনের এই অধঃপতন দেখা দিয়াছিল এবং তাহা অনুসরণ করিয়াই মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছেন। যে কথা ইতালীয় কবি ওভিদের পক্ষে সত্য, মধুসূদনের পক্ষে তাহা সত্য ছিল না।

তথাপি একটি পত্রিকার মধ্যে প্রেমের দেহোত্তীর্ণ পরিচয় যে এক উচ্চ নৈতিক আদর্শের সূত্রে বিধৃত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর উচ্চ নীতিবোধ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পত্রিকাটির নাম 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী'। যে দেহাশ্রয়ী প্রেমের কথা অন্যান্য পত্রিকায় সাধারণত কীর্তন করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মধুসূদনের উপর বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্রের প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাগণ যে তাঁহার নায়িকা বিদ্যার প্রভাব মুক্ত, তাহা সর্বত্র বলা যায় না। কিন্তু এই একটি মাত্র পত্রিকার নায়িকা চরিত্র ইহাদের মধ্যে একটি অপূর্ব ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে—ইহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বহু দূর চলিয়া গিয়া এক সমুচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাহ্নবী শান্তনুকে বলিতেছেন—

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব, কুল-মান-ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ' বিশ্বমণ্ডলে!

* * * *

পূর্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেন্দ্র-নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কাব্য, পুরাণ নহে। সুতরাং ইহা পৌরাণিক নীতি-কথা নহে, ইহার মধ্যে একটি সুগভীর জীবন সত্য আছে; তাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহা কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য নহে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে আমরা যে সকল নারী-চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে জাহ্নবীর স্বাতন্ত্র্য অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে। প্রেম ও প্রেমের তপস্যায় তাহাদেব যে গৌরবই প্রকাশ পাক না কেন, এখানে জাহ্নবী চরিত্রের মধ্যে যে একটি সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ভারতীয় সাহিত্যের নারীচরিত্রে খুব সুলভ নহে। ইহার মধ্যে নারীচরিত্রের যে একটি স্বতন্ত্র মহিমার বিকাশ হইয়াছে, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়াই আসিয়াছে। ইহা যেমন ইতালীয় কবি ওভিদের অনুকরণজাত নহে, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকেরও অনুগামী নহে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদনের জননীর নাম জাহ্নবী দেবী। জননী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা জীবনে মধুসূদন কাহাকেও করেন নাই, তাঁহার উপরও জননীর অপরিসীম প্রভাব ছিল। তিনি এই পত্রিকাটির পরিকল্পনায় মহাভারতের কাহিনী ভিত্তি করিয়া লইলেও জননী জাহ্নবী দেবীর পরিচয়টিকে প্রত্যক্ষ রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য এই চরিত্রটি বিশেষ মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে—কেবলমাত্র গতানুগতিক বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজের চারিদিক

দিয়া নারী-সম্পর্কিত যে শ্রদ্ধাবোধ জাগিতেছিল, মধুসূদনের জননী জাহ্নবী দেবীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবোধও তাহারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, একদিক দিয়া তাঁহার অনুভূতিশীল কবিমন, অন্যদিক দিয়া তাহার উপর তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব, ইহাদের উভয়েরই ফলে মধুসূদনের মানস-প্রকৃতি তাহারই অনুকূলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকার মধ্যে জাহ্নবী চরিত্রে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যতটুকু মধুসূদনের উপর তাঁহার জননী-চরিত্রের প্রভাবের ফল, ততটুকুই যুগোচিত। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী সমাজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে নারীচরিত্র সম্পর্কে ধারণার যে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকাটিও এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এ'কথা সত্য যে, ইহাতে জনার মধ্যে জাহ্নবী চরিত্রের মহিমা প্রকাশ পায় নাই; কারণ, তাঁহার মুখে কতকগুলি অত্যন্ত নীচ এবং হীন কটূক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে; তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহাতেও জনার যে আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই নির্দ্বন্দ্ব। জনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাহ্নবী হইতেও স্পষ্টতর। এই শ্রেণীর নারীচরিত্র ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল। মূল মহাভারতে কেবলমাত্র অপমানিত দ্রৌপদীর মধ্যে এই চারিত্রশক্তির বিদ্যুদ্দীপ্তি কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাহা সেই মুহূর্তেই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। জনার দীপ্তি তাহা হইতেও অধিক, ইহা অনির্বাণ এবং ইহার লক্ষ্য অবিচল। নারীচরিত্রের এই বিশিষ্ট গুণ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চেতনা লব্ধ—এ'কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই চরিত্রটির প্রধান ত্রুটি ইহার আনুপূর্বিক সামঞ্জস্যহীনতা। ইহার এই উদার পরিকল্পনা কোন কোন বহির্মুখী বিষয়ের অনুকরণের ফলে বিপর্যস্ত হইয়াছে—জাহ্নবীর মত আনুপূর্বিক সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আরও একটি পত্রিকার মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব

সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী'। প্রাচীনতম ভারতীয় সমাজে বিবাহ বিষয়ে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা পরবর্তী কালের মনু-স্মৃতি দ্বারা শাসিত সমাজে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহার পর হইতে নারী-জীবনের ব্যক্তিগত সুখদুঃখবোধ সমাজ-বিধানের পাদমূলে বিসর্জিত হইয়া আসিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের মুহূর্তে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিল। নারী-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে তাহার সেদিন যে'রূপই প্রকাশ পা'ক না কেন, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহার জন্য যে সহানুভূতি জাগ্রত হইয়াছিল, মধুসূদনের এই পত্রিকাটি তাহার প্রথম প্রমাণ। ইহার মধ্যে বিবাহ বিষয়ে নারীর স্বাধীন মনোভাব প্রকাশের পরিচয় আছে। এই কথা সত্য, এই পরিচয় পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্ত্য সমাজের রূপ লাভ করে নাই, ভারতীয় নারী-জীবনে সুকঠিন সংযম ও শালীনতাবোধের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ হইয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে বিবাহ বিষয়ক নারীর স্বাধীন মনোভাবের যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। ঈশ্বর গুপ্ত নারী লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, রঙ্গলাল নারীকে দেবী করিয়াছেন; কিন্তু নারীর যথার্থ রক্তমাংসের অনুভূতি রক্ষা করিয়া তাহার স্বাভাবিক মানবিকতার ভিতর দিয়াই তাহার ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। অথচ ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের মর্যাদা ইহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নারীর বিবাহ কিংবা প্রেমবিষয়ক স্বাধীনতা বর্ণনার মধ্যে কতকগুলি কঠিন দায়িত্ব আছে—সংযম তাহাদের মধ্যে প্রধান, মধুসূদনের এই অভিজাত পৌরাণিক চরিত্রটি বিষয়ে যে সংযম পালনের নিষ্ঠা দেখা যায়, তাহা বিস্ময়কর। ইহার মধ্যে ইতালীয় কবির অনুকরণ নাই বলিয়াই মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভা যতখানি স্পষ্ট হইয়াছে, অনুকরণ-জাত অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে তাহা তত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে কাহিনীর ভারতীয় পরিবেশ সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়াই ভীষ্মক রাজপুত্রী রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের কথা মধুসূদন প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অন্যান্য কোন কোন

পত্রিকার মধ্যে লালসার যে চিত্র নারীচরিত্রগুলিকে কলুষিত করিয়াছে, কিংবা আদর্শবাদের স্পর্শ যেমন ইহাদিগকে রক্তমাংসের সম্পর্কশূন্য করিয়াছে, এখানে তাহা নাই। এখানে নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমানুভূতি বাস্তব জীবন-রসাশ্রিত হইয়াও স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। কুমারীর সুকুমার লজ্জাবোধের সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বহির্মুখী সমাজস্বার্থের সঙ্গে আত্মমুখীন ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই সংযত ও সুনিপুণ বর্ণনায় এই রচনাটি সার্থক। ইহার ভাষার মধ্য দিয়া এই গুণ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। পরে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন—

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি যদুমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব, সরমে ;
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া থরথরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ' সংসারে।

ইহাতে ভারতীয় নারীত্বের সনাতন আদর্শও যেমন বিসর্জিত হয় নাই, তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধেরও প্রথম উন্মেষ অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না। কৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণা রুক্মিণী যেদিন দেখিতে পাইলেন, চেদীরাজ শিশুপাল তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক আহূত হইয়াছেন, তখন তিনি নিজে ভ্রাতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া নির্বিকার না থাকিয়া তাঁহার কুমারী-জীবনের স্বপ্ন শ্রীকৃষ্ণকে পত্র দ্বারা আহ্বান করিতেছেন। এই প্রেম রূপজ মোহ-জাত নহে; ইহা পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের মত; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের কথা ইহাতে নাই, ভাব-স্বপ্নের কথাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে—

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায়মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তারে ;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেব নরোত্তমে
বর ভাবে ! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি, কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগৎ-কর্ণে সুধার লহরী !

এখানে ইতালীয় কবি ওভিদের কোন দিক দিয়াই অনুকরণ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে একদিক দিয়া যেমন ভারতীয় সংস্কারে সুগভীর বিশ্বাসেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত সামাজিক মনোভাবেরও সংযত অভিব্যক্তি রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের সঙ্গে এখানে উনবিংশ শতাব্দীর যুগচেতনার সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই এই রচনাটির একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সর্বত্র প্রকাশ পায় নাই।

এইবার আর একটি পত্রিকার কথা এখানে আলোচনা করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে তাহাতে নারীর অসংযত ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে ; ইতালীয় কবি ওভিদের অন্ধ অনুকরণই ইহার মূল, নতুবা আত্মবোধ কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের অর্থ যে নারীর স্বৈরাচার নহে, তাহা মধুসূদনের মত ব্যক্তির না জানিবার কোনও কথা ছিল না। এই পত্রিকাটির নাম 'সোমের প্রতি তারা'। ইহাতে গুরুপত্নী তারা পুত্রতুল্য শিষ্য সোমের প্রতি নির্লজ্জ আসক্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাকে নারীর স্বাভাবিক প্রেম, প্রেমে স্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে ; ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী নারীর নব জাগৃতিরও কোন দিক দিয়াই পরিচায়ক নহে—ইহা শাশ্বত আদিম জৈব লালসারই অভিব্যক্তি মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে নারী সম্পর্কিত যে শুচিশুভ্র পবিত্র মনোভাবের বিকাশ হইতেছিল, এই শ্রেণীর রচনা বরং তাহাকে নানা দিক দিয়া আবিল করিয়া তুলিয়াছে। ইহা নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতারও পরিচায়ক নহে ; কারণ, স্বাধীনতা কথার মধ্যে

ব্যক্তি ও সমাজ-কল্যাণের কথা আছে, ইহার মধ্যে তাহা নাই। ইহা কেবল অকল্যাণকরই নহে, ইহা কুৎসিৎ এবং নারকীয়। এখানে মধুসূদন ওভিদের অন্ধ অনুকারক, নিজস্ব নীতিবোধ কিংবা যুগধর্ম উভয়ই এই অনুকরণের মূলে নির্মমভাবে বিসর্জিত হইয়াছে। ওভিদ ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রণয় কিংবা সপত্নী পুত্রের সঙ্গে বিমাতার প্রণয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকার কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু মধুসূদনের 'সোমের প্রতি তারা'য় সেই বিশিষ্ট পটভূমিকা ছিল না, তিনি প্রাচীন ইতালীয় নারীজীবনের একটি বিচ্ছিন্ন পত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে আনিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—সেইজন্য ইহার অসম্ভাব্যতা এবং অবাস্তবতা বাঙ্গালী পাঠককে সহজেই আঘাত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাতির প্রতি এই দেশের সমাজে যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিকাশ হইতেছিল, ইহার মধ্যে তাহার কোন পরিচয়ই প্রকাশ পায় নাই; ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম লালসাকে শাসন করিয়াই মনুষ্যত্বের বিকাশ, মনুষ্যত্বের বিকাশই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগৃতির লক্ষ্য ছিল, ইহার মধ্যে তাহাই অস্বীকৃত হইয়াছে। 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা' এবং 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকার মধ্য দিয়াও ইতালীয় কবি ওভিদের কয়েকটি পত্রিকার অনুযায়ী যে লালসার চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাদের পরিবেশ ও পরিচয় স্বতন্ত্র বলিয়া 'সোমের প্রতি তারা'র মত পাঠক মনকে এত তীব্রভাবে আঘাত করিতে পারে না। তবে তাহাদের নায়িকাকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজের নারী সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে—ইহারাও প্রাচীন ইতালীর স্বপ্নছায়ায় পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

সুতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে কেবল মাত্র যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত যুগচেতনারই অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, তাহা নহে—ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শেরই সংমিশ্রণ রহিয়াছে; তথাপি ইহাদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগ-মানস একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই, এ' কথাও সত্য।

৬

কেন্দ্রীয় ঐক্য

পূর্বেই বলিয়াছি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন সর্গগুলির মধ্য দিয়া ভাবগত কোনও ঐক্য অনুভব করা যায় না ; ইহাদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা কেবল মাত্র রচনা অর্থাৎ বহিরঙ্গগত। এমন কি, ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যে ভাব ও রসগত যতখানি অখণ্ডতা আছে, মধুসূদনের কাব্যে তাহাও নাই। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সর্গগুলি পর পর যথেচ্ছ বিন্যাস করা হইয়াছে, একটির সঙ্গে ইহার পরবর্তী সর্গটি কোন যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার প্রথম সর্গে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'র পত্রে প্রণয়ীর জন্য সুগভীর প্রেমের অনুভূতি যেমন সংযত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, দ্বিতীয় সর্গেই 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় লালসার এক ঘৃণ্য চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে। এই সর্গটি পাঠ করিবার পর যখন আমরা তৃতীয় সর্গে 'দ্বারকানাথেব প্রতি রুক্মিণী'র পত্রটি পাঠ করি, তখন তাহাতে সলজ্জ কুমারী-হৃদয়ের সাত্ত্বিক প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। এই ভাবে সর্গ হইতে নূতন সর্গে উপস্থিত হইয়া অনেক সময় পরস্পর বিপরীত-ধর্মী ভাবের প্রকাশও দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যের একটি বিষয়ে এই ঐক্য ছিল যে, তাঁহার প্রতিটি কাব্যের বিষয় ছিল প্রেম—সমাজ-বিগর্হিত প্রেমই হউক, কিংবা সমাজ-সম্মত প্রেমই হউক, নারী-হৃদয়ের এই শাশ্বত অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রতিটি সর্গ রচিত হইয়াছে। বিশেষত তাহার সঙ্গে সমসাময়িক ইতালীয় সমাজের নারী চরিত্রের অনেকখানি যোগ ছিল বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বিশেষ একটি শক্তিও প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি সর্গেরই যে প্রেমই একমাত্র উপজীব্য তাহা নহে—কোনটির মধ্যে বীরত্ব, কোনটির মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি, কোনটির মধ্যে উচ্চ নীতি ইত্যাদির কথাও

আছে। যেমন 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় বীরত্ব, 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রিকায় বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি, কিংবা 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকায় উচ্চ নীতির কথা প্রচারিত হইয়াছে। বলাই বাহুল্য যে, ইহাদের মধ্য দিয়াও যেমন পরস্পর ঐক্য নাই, তেমনই ইহাদের কাহারও সঙ্গে প্রেম বিষয়েরও সম্পর্ক নাই। এমন কি, এই সকল বিষয় বাদ দিলেও নরনারীর প্রেম সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াও যে সকল পত্রিকা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও প্রেমের স্বরূপের দিক হইতে নানা বিষয়ে অনৈক্য রহিয়াছে। 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'র প্রেম ও 'সোমের প্রতি তারা'র প্রেম এক নহে, কিংবা 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী'র প্রেম, কিংবা 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'র প্রেমও এক নহে। সুতরাং প্রেম বিষয়ের মধ্যেও ইহাতে ঐক্য নাই। প্রেম এবং মোহ ইহাতে দুইই আছে, অথচ ইহাদের উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে ভাবগত এই সকল পরস্পর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, ইহার বিষয়গুলিকে যে মধুসূদন একই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিভিন্ন সর্গে ভাগ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন খণ্ড গীতিকবিতার আকারে প্রকাশ করেন নাই, তাহার কারণ কি? ইহাতে কি কোন দিক দিয়াই ক্ষীণতম ঐক্যও রক্ষা পায় নাই?

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার ঐক্য যতটা বহিরঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্তরঙ্গে ততটা প্রকাশ পায় নাই। বহিরঙ্গের ঐক্যের মধ্যে ইহাতে সর্বত্র একই অমিত্রাক্ষর ছন্দ আনুপূর্বিক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রচনার দিক দিয়া বিচার করিলে এই অভিন্ন ছন্দের ভিতর দিয়াও একটি অখণ্ড গীতিসুর বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুসূদন রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, এই শ্রেষ্ঠতা ইহার মহাকাব্যোচিত বলিষ্ঠতায় নহে, বরং গীতিকাব্যোচিত রস-পরিবেশন ও সুরমাধুর্যে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাতে একটি অখণ্ড সুর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, ভাবের অনৈক্যও বিষয়গত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও এই সুরের প্রবাহ কোথাও খণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই। মধুসূদন শব্দ ও ধ্বনিশিল্পী,

সুতরাং শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য দ্বারা পদের ধ্বনিগুণ বৃদ্ধি ও সুরতরঙ্গ সৃষ্টি করিবার দিকে তাঁহার যতখানি লক্ষ্য, ভাবের ঐক্য সৃষ্টি করিবার দিকে তত লক্ষ্য নাই। সেইজন্যই বহিরঙ্গে ইহার যে ঐক্য ও অখণ্ডতা সৃষ্টি হইয়াছে, অন্তরঙ্গে তাহার অভাব অনুভূত হইবে। এমন কি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিষয় ও ভাবের দিক দিয়া অনৈক্য থাকিলেও প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই প্রায় অভিন্ন চিত্রকল্প সৃষ্টি হইয়াছে—প্রথম পত্রিকা হইতে শেষ পত্রিকা পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। ইহার কারণ, ইহার মধ্যে রোমান্টিক কবিতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা অপেক্ষা 'এপিকে'র প্রত্যক্ষতার গুণই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং মহাকাব্যের মত স্থানে স্থানে ইহাতে বর্ণনার বিস্তার ও বিষয়ের স্পষ্টতার যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই ইহার মধ্যে কতকগুলি গতানুগতিক বর্ণনারও লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সেইজন্য প্রথম সর্গের 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'র পত্রে যেমন এই মহাকাব্যোচিত বর্ণনা আছে—

পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিরাজি, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ !

তেমনই দ্বিতীয় সর্গের 'সোমের প্রতি তারা'য় অনুরূপ এই মহাকাব্যোচিত বর্ণনা পাওয়া যাইবে,

চাহিনু, কাঁদি বনদেবী পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চি কটিদেশে !

কিংবা পঞ্চম সর্গে 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা'তেও পাওয়া যায়—

ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ ; ভুলি রত্নরাজি,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী !

মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে।

এই প্রকার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বহিরঙ্গ গঠনে কিছু কিছু ঐক্য দেখা গেলেও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ইহাতে ঐক্য নাই। এইজন্য ইহা মহাকাব্য না হইয়া গীতিকাব্য।

ইতালীয় কবি ওভিদকে অনুকরণ করিবার ফলেই এখানে মধুসূদন বিভিন্ন প্রকৃতির নারীচরিত্র আনিয়া এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—নতুবা ইহাদের ভিতর দিয়া কোন মৌলিক ঐক্যের অনুভূতি হইতে তিনি এই কাজ যে করেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ওভিদও বিভিন্ন প্রকৃতি এবং পরিবেশের অধীনস্থ নারীচরিত্রকে এক সূত্রে গাঁথিয়াছেন; কিন্তু ওভিদের সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্য এই যে, প্রেম ব্যতীত ওভিদের আর কোন বিষয় ছিল না—প্রেমানুভূতির সর্বজনীনত্ব এবং অখণ্ডতার ভিতর দিয়াই তাঁহার কাব্যের কেন্দ্রীয় ঐক্য রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে কেবল মাত্র ইতালীয় নারীচরিত্র-সুলভ প্রেমেরই কথা প্রকাশ পায় নাই, ইহার মধ্যে ভারতীয় নারীত্বের প্রেমবোধেরও সংমিশ্রণ হইয়াছে; তদুপরি বীর্য, নীতি, স্বার্থপরতা এই সকল বিভিন্নমুখী বিষয় আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং ওভিদের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, মধুসূদনের মধ্যে তাহা নাই।

৭

শ্রেণীবিভাগ

মধুসূদনের জীবন-চরিত লেখক স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একাদশটি সর্গকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যেমন '১ম, প্রেম পত্রিকা ;—প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া প্রেমিকার পত্র। তারা, শূর্পণখা, উর্বশী এবং রুক্মিণীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ২য়, প্রত্যাখ্যান পত্রিকা ;—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধমূলক প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পত্র। জাহ্নবীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়, স্মরণার্থ পত্রিকা ;—স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুলা অথবা স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় উৎকণ্ঠিতা প্রোষিতভর্তৃকার পত্র। শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী এবং দুঃশলা এই চারিজনের পত্র এই শ্রেণীস্থ। ৪র্থ অনুযোগ-পত্রিকা ;—স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মপীড়িতা, মুখরা বামার পত্র,—কেকয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত।'

আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারণ ভাবে এই প্রকার একটি শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জড় পদার্থ ও ইতর প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হইলেও মানুষের শ্রেণীবিভাগ সকল সময় নির্ভুল হইতে পারে না। কারণ, মানুষ প্রত্যেকেই এক একটি শ্রেণী। বিশেষত যে কাব্য সৃষ্টি হিসাবে সার্থকতা লাভ করে, তাহার প্রত্যেকটি নরনারী এক একটি বিশিষ্ট চরিত্ররূপে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে, একটি চরিত্রের সঙ্গে আর একটি চরিত্রের অন্তরে ও বাহিরে কোন দিক দিয়াই ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে না। যদিও বা হয়, তথাপি তাহা এত সামান্য যে তাহা লক্ষ্য-গোচর হইতে পারে না। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও যে একাদশটি নায়িকা চরিত্র আছে, ইহাদের যদি একাদশটিরই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয় প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে কাব্য হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে, এই কথাই মনে করিতে হইবে। নরনারীর শ্রেণীবিভাগ কেবল

মাত্র বহির্মুখী কতকগুলি অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই সম্ভব, ইহাদের মূল অন্তরগত প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে তাহা সম্ভব হয় না।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যে শ্রেণীবিভাগের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহাও স্বর্গত বসু মহাশয় নায়িকাদিগের বহির্মুখী কতকগুলি অবস্থাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহা দ্বারা প্রত্যেকটি চরিত্র পারস্পরিক অন্তর্মুখী সূক্ষ্ম পার্থক্যের ভিতর দিয়া যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার স্বীকৃতি প্রকাশ পায় না। সুতরাং এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ দ্বারা কখনও নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যাইতে পারে না। উক্ত জীবনীকার এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে যে বৈষম্য বর্তমান থাকে, তাহার পরিস্ফুটন করিয়া যিনি যে পরিমাণে প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার নৈপুণ্য সেই পরিমাণে প্রশংসনীয়।' সুতরাং যদি তাহাই হয়, তবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া নরনারী চরিত্রের রহস্য উদ্ধার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই ইহার স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়, তারা, শূর্পণখা, উর্বশী ও রুক্মিণীদেবী সকলেই উক্ত সমালোচকের মতে 'প্রেমিকা'; কিন্তু তাহাদের নাম কি একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়? তারার সঙ্গে রুক্মিণীর 'প্রেমে'র অনুভূতিতে যে পার্থক্য, তাহা কি কেবল মাত্র বহির্মুখী অবস্থাগত, না মূলগত? যদি বলি রুক্মিণীর তুলনায় তারার প্রেম প্রেমই নহে, ইহা কাম বা লালসা কিংবা ইহা রূপজ-মোহ, তাহা হইলে কোথায় ভুল হয়? এখানে রুক্মিণী যে ইহাদের তিনজন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা তাহাকে ইহাদের সঙ্গে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করিলে কি ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই? এমন কি, তারা ও শূর্পণখার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা ইহারা একই শ্রেণীভুক্ত হইলে বুঝিবার পক্ষে সহায়ক না হইয়া কঠিন হইয়া পড়িবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। এখানে চারিটি নারীচরিত্রের পরিচয়ই চারি প্রকার; যেমন, তারা ব্যাভিচারিণী, শূর্পণখা বিলাসিনী, উর্বশী বারাঙ্গনা এবং

রুক্মিণী অনূঢ়া রাজকুমারী। সুতরাং ইহাদের প্রেমানুভূতি অভিন্ন হইতে পারে না। লালসা, আসক্তি, মোহ ও প্রেম এক নহে—যাহারা এই সকল বৃত্তির অধিকারিণী, তাহারাও সেইজন্যই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, উক্ত সমালোচক জাহ্নবীর চরিত্রকে আর কাহারও সঙ্গে যুক্ত করিয়া কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিয়া একমাত্র তাহাকে লইয়াই একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' চরিত্র-সৃষ্টি যদি সার্থক হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকটি নায়িকা চরিত্র লইয়াই এমন এক একটি শ্রেণী নির্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া যে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না।

স্বর্গত বসু মহাশয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলা চরিত্র লইয়া যে 'স্মরণার্থ পত্রিকা'র নায়িকা বলিয়া নায়িকার আর একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার সম্পর্কেও বলা যায় যে, বহির্মুখী অবস্থার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে ঐক্য নাই।—শকুন্তলার সঙ্গে তাহার স্বামী দুষ্মন্তের যে ক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের সে সম্পর্ক ছিল না, সুতরাং ইহাদের মনোভাবে যে পার্থক্য থাকা আবশ্যক, মধুসূদন তাহা সতর্কতার সঙ্গেই রক্ষা করিয়াছেন। ভানুমতী এবং দুঃশলা বিভিন্ন অবস্থার অধীনা, তাহাদের মধ্য দিয়া মনোভাবেরও সেই বিভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং ইহাদের মধ্যেও অন্তরগত ঐক্য অনুভব করা যায় না। তারপর সর্বশেষে কেকয়ী এবং জনা—ইহাদের দুইজনকেও একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কতদূর সমীচীন হয়, তাহাও বিবেচনার বিষয়। জনা ক্ষাত্র বীরত্বের উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ, কেকয়ী হীন স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা চালিত। সুতরাং ইহাদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, তাহাও বিবেচনার বিষয়। সুতরাং দেখা যায়, যেখানে মানুষের চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা আছে, সেখানে তাহাদিগকে লইয়া শ্রেণীবিভাগ

করা সম্ভব হয় না। যেখানে চরিত্র বৈশিষ্ট্যবর্জিত টাইপ ছাঁচে ঢালাই মাত্র, সেখানেই শ্রেণীবিভাগ সম্ভব।

উক্ত লেখকের পরিকল্পিত সর্বশেষ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। এই বিভাগের তিনি নামকরণ করিয়াছেন 'অনুযোগ পত্রিকা' এবং কেকয়ী ও জনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কেকয়ী এবং জনা যেমন একই আদর্শে উদ্বুদ্ধা নহেন, তেমনই একই অবস্থার অধীনাও নহে। দাসীর প্ররোচনায় কেকয়ী নীচ স্বার্থপরতা-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত, নিজের পুত্রের স্বার্থসিদ্ধি অপেক্ষা নিরপরাধ সপত্নী-পুত্রের সর্বনাশ করিতে উদ্যত; কিন্তু জনা অন্যায় পুত্র-হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধা এবং ক্ষাত্র কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধা। এক দিক দিয়া হীন স্বার্থপরতা, আর এক দিক দিয়া সমুচ্চ নৈতিক প্রেরণায় পার্থিব সকল স্বার্থের বিসর্জন; এক দিক দিয়া পুত্রের সৌভাগ্য বৃদ্ধির অন্যায় প্রচেষ্টা, আর এক দিক দিয়া ধর্ম ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বীর সঙ্কল্প; সুতরাং উভয়ের অন্তর্মুখী পরিচয় বিভিন্ন, এমন কি, ক্ষীণতম ঐক্যসূত্রেও আবদ্ধ নহে। বহির্মুখী বিষয়ে কেকয়ী ও জনা উভয়েই সন্তানের জননী এবং রাজমহিষী হইলেও একজন সন্তানের সদ্য মৃত্যুশোকাতুরা, আর একজন সন্তানের অন্যায় সৌভাগ্যসন্ধানী। সুতরাং অন্তরগত লক্ষ্যের দিকেও ইহাদের মধ্যে ঐক্য নাই।

সুতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি নায়িকাই এক একটি শ্রেণী; একটিকে আর একটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

৮

চরিত্র-বিচার

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' কাহিনী নাই, এ'কথা সত্য ; কিন্তু ইহার চরিত্র-গুলি সাধারণ গীতিকবিতার চরিত্রের মত ভাবমূলক নহে, ইহাদের মধ্য দিয়া রক্তমাংসের নারী চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, এই গুণে ইহা মহাকাব্যধর্মী। বিশেষত পূর্বেকার আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টির কেবলমাত্র যে অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে—চরিত্র সৃষ্টি নানা দিক দিয়া ইহাতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। প্রেমই প্রধানত চরিত্রগুলির অবলম্বন হইলেও বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া প্রেমের অনুভূতি যে কত বিচিত্র পরিচয় লাভ করিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে চরিত্রগুলির ক্রম-বিকাশ নাই এই কথা সত্য, তাহা হইলে ইহা মহাকাব্য কিংবা নাটক হইত ; তথাপি চরিত্রগুলির বিশিষ্ট এক একটি পরিচয় যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান পরিচ্ছেদে চরিত্রগুলির এই বিশেষত্বগুলি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু প্রথমেই একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরিত্রগুলির কোনটিই কবির মনঃকল্পিত নহে, ইহারা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ হইতে আসিয়াছে ; কিন্তু ইহাদিগকে লইয়া মহাকাব্য রচিত না হইয়া রোমান্টিক গীতিকাব্য রচিত হইয়াছে; সেইজন্য ইহাদের সম্পর্কে কবির কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। মধুসূদনের কবি-প্রকৃতিও ইহাদের এই পরিচয় প্রকাশ করিবার অনুকূল ছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্য হওয়া সত্ত্বেও তাহাতেও যে তিনি কতকগুলি চরিত্র সম্পর্কে কি ভাবে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও তাহার ব্যতিক্রম হইবে, এমন আশা করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত-পক্ষে তাহা হয়ও নাই। সুতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন সর্গে বর্ণিত চরিত্রগুলির আলোচনা কালে ইহাদের প্রত্যেকটিরই যে পৌরাণিক ঐতিহ্য আছে, তাহা বিস্মৃত না হইলে এই রোমান্টিক গীতিকাব্যের

যথার্থ রস উপলব্ধি করা যাইবে না ; ইহাতে মধুসূদনকেও ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর যে অংশে মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন, সেই অংশে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের যে পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহা নহে—বরং পুরাণকে জাতীয় নবজাগরণের নূতন চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, প্রত্যেক জাতির মধ্যে ইহাই রেনাসাঁ বা জাতীয় নবজাগরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মধুসূদনও তাঁহার মহাকাব্যেই হউক, কিংবা গীতিকাব্যেই হউক সর্বত্র সেই প্রয়াসই পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের এইখানেই পার্থক্য ছিল। মধুসূদন পুরাণকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র পুরাণেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সেইজন্য পৌরাণিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করিবার দিক হইতে দুইজনের দুই শ্রেণীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আমরা গিরিশচন্দ্রে আশা করি না, তেমনই গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিও মধুসূদনে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। অনেকে এই বিষয়টি বুঝিতে না পারিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র কতকগুলি চরিত্র বিচার করিতে গিয়া মধুসূদনকে ভুল করিয়াছেন। পুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিলেও মধুসূদন এখানে যে পৌরাণিক কাব্য রচনা না করিয়া রোমান্টিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র চরিত্রগুলি বিচার করিলে মধুসূদনের উপর সুবিচার করা হইবে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি সর্গই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন খণ্ডকাব্য—ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি পটভূমিকা থাকিলেও চরিত্র বিচারে তাহা মুখ্য বলিয়া বিবেচনা না করিয়া গৌণ বলিয়া বিবেচনা করিলেই চরিত্রগুলি সম্পর্কে ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি সর্গে একটি করিয়া মাত্র চরিত্র, চরিত্রের কোন ক্রিয়া (action) নাই, ইহাদের মনোগত এক একটি সূক্ষ্ম ভাব (idea)ই সর্গগুলির বর্ণনার বিষয়—এই গুণেই ইহা গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। এই ভাবটিরই সার্থক উপলব্ধির ভিতর দিয়া

চরিত্রগুলির তাৎপর্য সার্থকভাবে অনুভব করা যাইবে—তাহার পরিবর্তে ইহাদের পশ্চাদ্দেশবর্তী বিস্তৃত পটভূমিকার উপর যদি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম ভাবটি অন্তর্হিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এখন প্রত্যেকটি সর্গ হইতেই চরিত্রগুলি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যাইবে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রথম সর্গের নাম 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা'। ইহার নায়িকা শকুন্তলা,—দুষ্মন্তও এখানে বীর নহে, শকুন্তলাও এখানে বীরাঙ্গনা নহে; শকুন্তলার ভাষায় দুষ্মন্তের একমাত্র পরিচয় এই—

যথায় বসি, প্রেম-কুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহ-জ্বালা!

অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র বিরহিণীর বিরহ-জ্বালার নিবারক। সমগ্র সর্গের মধ্যে দুষ্মন্তের এই আচরণটুকুরই শুধু উল্লেখ আছে; ইহা বীরত্বের কোন কথা নহে এবং তাঁহার বিস্মৃতা পত্নীকেও বীরাঙ্গনা বলিয়া ভুল করিবারও কোন কারণ নাই। 'বীরাঙ্গনা' কথাটি মধুসূদন এই কাব্যে অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সে' কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এই সর্গে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে এক অপরিসীম মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষত্রিয় বালিকার দৃপ্ত তেজ ও অহঙ্কার তাহার মধ্যে নাই, থাকিবার কথাও নহে; নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া সে গোপনেই তাহার প্রেমের কথা ধ্যান করে,—ইহা যেমন তাহার লজ্জা, তেমনই তাহার গর্ব; বাহিরে কেহ তাহা বুঝে না, সখীদিগের অনুযোগ সে নীরবে শুনিয়া যায়—

নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ংবদা তোমায়,—কি ব'লে
বুঝা'বে এ' দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে?

সে স্বামিগত-প্রাণা। যে স্বামী গোপনে বিবাহ করিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহারও অমঙ্গল চিন্তা মনে স্থান দেয় না, এমন কি, কেহ সে'জন্য তাহার প্রণয়ীকে অভিশাপ দিতে পারে ভাবিয়াও শঙ্কিত হইয়া উঠে—

> শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
> নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি,—
> কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।

কবি কালিদাস কর্তৃক পরিকল্পিত শকুন্তলার স্বামি-তন্ময়তার চিত্রটি মধুসূদন এখানে সার্থকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

শকুন্তলা নির্লোভ, হস্তিনার সম্রাট দুষ্মন্তের ঐশ্বর্যের প্রতি তাহার লোভ নাই। কিন্তু দুষ্মন্তের যে ঐশ্বর্যের অভাব নাই, এই বিষয় সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ সচেতন আছে ; কারণ, সে রাজার ঐশ্বর্য-জীবনের কিছু পরিচয় দিয়া বলিয়াছে,

> কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
> দাসী ভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে।

আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার মুখে তাহার প্রণয়ীর 'দেবেন্দ্র সদৃশ ঐশ্বর্যে'র কথা প্রকাশ না পাইলেই ভাল হইত। ইহা সত্ত্বেও বিরহিণী শকুন্তলার ক্ষণিক স্বামিসৌভাগ্যের স্মৃতি তাহাকে যে কি প্রকার ব্যাকুল করিয়াছে, তাহা কবি সার্থকভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার বিরহ-কাতরতা, 'আশামদ-মত্ত' 'পাগলিনী' রূপ তাহাকে ভারতীয় নারীত্বের একটি বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইহার পরিকল্পনায় বৈদেশিক প্রভাব নাই, বরং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকার চরিত্রের কতকটা প্রভাব অনুভূত হইবে—ইহার পরিকল্পনায় ভারতীয় নারীত্বের সনাতন আদর্শ বিসর্জিত হয় নাই, ইহার সম্পর্কে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় মধুসূদন এক উদ্দাম লালসাময়ী নারীর নির্লজ্জ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মুখের পরিচয়, তিনি গুরুপত্নী ; কিন্তু তাঁহার আচরণ ইহার কেবলমাত্র যে ব্যতিক্রমই

মাত্র তাহা নহে, বরং সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা স্বৈরিণী—আসক্তি প্রকাশ করিতে স্থান-কাল এবং পাত্রাপাত্র-বিচার-বুদ্ধিহীনা। ইহা অন্ধ আদিম লালসা মাত্র—প্রেম নহে; যেখানে প্রেম নাই, সেখানে প্রেমে স্বাধীনতার কথাও নাই। আত্মবোধ ও স্বৈরাচার এক কথা নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এ'দেশের সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, এমন কি, মধুসূদনও অন্যত্র যাহার সার্থক পরিচয় দিয়াছেন, এখানে তাহারই বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা যুগচেতনার ফল নহে, বরং দুই সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তী একজন বিদেশীয় সমাজের কবিকে অন্ধভাবে অনুকরণেরই ফল।

তারা এখানে পাপীয়সী, কিন্তু পাপ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, অজ্ঞানত যে তিনি পাপাচরণ করিতেছেন, তাহা নহে—

ইচ্ছা করে দাসী হ'য়ে সেবি পা দু'খানি!—
কি লজ্জা! কেমনে তুই; রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ' পাপ কথা, হায় রে কেমনে?

এই পাপবোধ তাঁহার মন হইতে মুহূর্তের জন্যও লুপ্ত হয় নাই,

বিদ্যালাভ হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে; গৃহকর্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির মধুমাখা।

কিন্তু প্রবৃত্তির শক্তি তাঁহার মধ্যে এত অধিক, যে কোন নীতিবোধ ধর্মবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না। তিনি তাঁহার সকল পরিচয় বিস্মৃত হইয়া স্বেচ্ছায় পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে উদ্যত হইলেন—

হে স্মৃতি, কুকর্মে রত দুর্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ; আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃচোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!

তারার মধ্যে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের যে প্রবৃত্তি দেখা দিল, তাহা তাঁহার পূর্বপরিচয়হীন, ভবিষ্যৎ-লক্ষ্যহীন এক অনিশ্চিত পরিণামের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তাহার অনুভূতির মধ্যে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

মন হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ মুছিয়া দিয়া কেবলমাত্র একটি শাশ্বত লালসার জৈববৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়া তাঁহার সকল লক্ষ্য তাহার দিকেই স্থির করিয়া রাখিলেন। সেইজন্যই তাঁহার এই অসংযত অভিব্যক্তি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

তারার চরিত্রের মধ্যে এখানে একটি সেবিকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু লালসার উগ্রতাকে অতিক্রম করিয়া তাহা কল্যাণীর রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। তাঁহার সেবার মধ্যে লালসার পিপাসা যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে প্রণয়াস্পদকে দাসীভাবে সেবা করিবার যে প্রেরণা আছে, তারার মধ্যেও সেই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তারা সোমের প্রণয়কে লাভ করিতে চাহেন না, বিনীতা দাসীর মত তাহা লাভ করিতে চান, ইহার মধ্যে তাঁহার কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় নাই, নির্বিচার আত্মসমর্পণই ইহার ধর্ম ; এই প্রেমে পাপ আছে, লালসা আছে, কিন্তু তন্ময়তার অভাব নাই।

পূর্বে বলিয়াছি, 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় অন্যান্য পত্রিকার মতই কোন কাহিনী নাই, বৃহস্পতিই হউন কিংবা সোমই হউন তাঁহাদের চরিত্র কিংবা আচরণ কিছুই প্রত্যক্ষগোচর নহে ; ইহাতে এক লালসাময়ী শাশ্বত নারীর গোপন মনোভাবের অভিব্যক্তি আছে। ইহা নাটক নহে, ইহা গীতিকবিতা। ওভিদের যুগে এই প্রবৃত্তি নারীহৃদয়ে যেমন সক্রিয় ছিল, মধুসূদনের যুগেও তেমনই ছিল, এই দৃষ্টি দ্বারা ইহার বিচার করিলে ইহার নীতিগত ত্রুটির কথা আমরা অনেকখানি বিস্মৃত হইতে পারিব।

'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকার রুক্মিণী চরিত্রটির ভিতর দিয়া যে মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবনের কস্তুরী চন্দন-

ধূপগন্ধে আদ্যোপান্ত সুরভিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-ভাগিনী হইবার যাঁহার অভিলাস তাঁহার উচ্চ চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করিয়াই কবি রুক্মিণীর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—পুণ্য সংসর্গে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ তিনি আকৈশোর ধ্যান করিয়াছেন, এই প্রেম রূপজমোহ-জাত প্রেম নহে, এমন কি, বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও অনেক সময় যেমন রূপের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা হইয়াছে, এখানে তাহা একেবারেই অনুপস্থিত। ঋষিমুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যনাম শুনিয়াই রুক্মিণী তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছেন—এখানে যেন রুক্মিণী চণ্ডীদাসের রাধা; জয়দেব, কিংবা বিদ্যাপতির রাধিকা নহেন—

শুনি নিত্য ঋষিমুখে হৃষিকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র,

ধ্যান-স্বপ্নে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছেন, কোনদিন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ এখনও পান নাই—

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেব নরোত্তমে
বরভাবে;

এই আত্মসমর্পণের মধ্যে গান্ধর্ব-বিবাহের লালসা নাই, রূপজ মোহের আত্মবিস্মৃতি নাই, অনাস্বাদিতপূর্ব কুমারী-হৃদয়ের দেহোত্তীর্ণ সুকুমার প্রেমানুভূতিই ইহার আশ্রয়। কোন দেহাশ্রিত রূপ অবলম্বন করিয়া রুক্মিণী হৃদয়ের এই প্রেমের বিকাশ হয় নাই, আকাশের কৃষ্ণমেঘে, সাত রঙা ইন্দ্রধনুতে, চকিত বিদ্যুত্যের নিমেষপাতে তাঁহার চোখে কৃষ্ণরূপের আভাস দিয়া যায়—

যত বার হেরি, দেব, আকাশমণ্ডলে,—
ঘনবরে, শক্রধনুঃ চূড়ারূপে শিরে,
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে,—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পুজি ভক্তিভাবে।

কুমারী-হৃদয়ের সলজ্জ অভিলাস কোনদিন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার আশা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার নীরব-উপাসনার ভিতর দিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছেন; এখনও তিনি তাহাই করিতেন, নিজের অভিলাস এই পত্রিকায়ও ব্যক্ত করিতেন না, নীরব কৃষ্ণ-ধ্যান, গোপন কৃষ্ণ-উপাসনা—ইহার অতিরিক্ত তাঁহার কামনা আর কিছু নাই; কিন্তু

এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে।

নতুবা আজীবন তাঁহার অন্তরের অভিলাস অন্তরেই গোপন থাকিত, কোনদিন বাহিরে প্রকাশ পাইত না। তাঁহার প্রেমে কোন স্বার্থবোধ নাই, প্রবৃত্তির তাড়না নাই, ঐহিক ঋদ্ধির কামনা নাই—ইহা যেন আপনা হইতে আপনিই অকারণ-জাত, সাত্ত্বিক কৃষ্ণপ্রেমের ইহাই স্বরূপ।

মধুসূদনের মধ্যে যে বৈষ্ণব-প্রাণতার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, রুক্মিণী চরিত্রের মধ্যে তাহারই একটি সাত্ত্বিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও এই পরিচয় নাই। শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তির যে পরিচয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, অথচ বারবারই তাহা লৌকিক ব্যাখ্যাতে বিকৃত হইয়াছে, মধুসূদনের রুক্মিণীর মধ্যে তাহারই সার্থক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন এখানে যতখানি সার্থক বৈষ্ণব, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' ইহার তুলনায় কিছুই নহেন। রুক্মিণী চরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার বৈষ্ণবভাবের অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে।

'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রিকার নায়িকা কেকয়ী যেমন বীরাঙ্গনা নহেন, তেমনিই প্রেমিকাও নহেন—প্রৌঢ়া নারীর বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি বোধই ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বার্থবোধ-জনিত যে নীচতা আছে, তাহাই ইহার সর্ববিধ উচ্চগুণ বিকাশের অন্তরায়

হইয়াছে। পূর্ববর্তী পত্রিকায় রুক্মিণী যেমন ঋষিমুখ হইতে কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাসিনী হইয়াছিলেন, কেকয়ী তাহার পরিবর্তে 'নীচকুলোদ্ভবা দাসী'র মুখ হইতে একটি সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত নীচ ভাষায় স্বামীর প্রতি অভিযোগ করিতেছেন। দুইজনের এই দুইটি সংসর্গের পরিচয়ের মধ্যেই দুইজনের চরিত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—একজন ঋষির কথায় বিশ্বাসিনী, আর একজন দাসীর কথায় বিশ্বাসিনী, ইহাই ইঁহাদের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কেকয়ীর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, তাঁহার স্বামি-সেবা; এই গুণটি দ্বারা অনেক দোষ কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই দিকটি এই কবিতার মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ পায় নাই, তাহার উল্লেখ মাত্র আছে; কিন্তু এমন ব্যঙ্গমিশ্রিত ভাষায় তাহার উল্লেখ দেখা যায় যে, তাহা দ্বারা জ্বালাই অধিক প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, জাগিতে পারে না। বরং এমন কতকগুলি হীন উক্তি কবি তাঁহার মুখে আরোপ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রতি সকল শ্রদ্ধাবোধ লুপ্ত হইয়া যায়। মধুসূদন রাজমহিষী ও ভরত-জননী কেকয়ীর পরিচয় কিংবা তাঁহার মনোভাব কিছুই সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই, এক অতৃপ্ত লালসাময়ী প্রৌঢ়ার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি কেকয়ী যে সকল কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিজাত পরিচয় রক্ষা করিতে পারে নাই; সুতরাং তিনি এখানে কেকয়ী নহেন, এক স্বার্থবঞ্চিতা অভিমানাহতা বিগতযৌবনা নারী—অবহেলায় ও অবজ্ঞায় তাহার অন্তরে অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য তাঁহার অভিযোগের ভাষা যেমনই ইতর, তেমনই নিষ্ঠুর। এই পত্রিকায় ঐতিহ্যের একটু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কেকয়ী মন্থরার মুখ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সংবাদ জানিয়াই দশরথের প্রতি অভিযোগ করিতেছেন—

> কি সত্য করিলা প্রভু, ধর্মে সাক্ষী করি,
> মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি

বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হ'লে !

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দশরথ পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা করিবেন, এখন তাহাব ব্যতিক্রম করিতেছেন ; এবং ইহার উপরই এই সমগ্র কবিতাটির পরিকল্পনা হইয়াছে। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে—দশরথ পূর্বে কেকয়ীকে দুইটি বর দিতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কি বর তিনি চাহেন, কেকয়ী তখন তাহা জানান নাই, পরে জানাইবেন বলিয়াছিলেন ; মন্থরার মুখে রাম-অভিষেকের সংবাদ শুনিয়া তাহারই প্ররোচনায় তখন তিনি দুইটি বর চাহিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু মধুসূদনের এই পত্রিকাটি রামায়ণের এই প্রচলিত কাহিনীর উপর পরিকল্পিত নহে—সেইজন্য কেকয়ীর অভিযোগ কতকটা দুর্বোধ্য।

'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা' পত্রিকায় আর এক দুর্দম লালসাময়ী নারীর অসংযত প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে মধুসূদন পুনরায় ইতালীয় কবি ওভিদের দ্বারে ফিরিয়া গিয়াছেন—পূর্ববর্তী দুইটি কবিতার এই ত্রুটি ছিল না। ইহার মধ্যে নিষ্কাম কিংবা সাত্ত্বিক প্রেমের কথা নাই, ইহার মধ্যে লালসার কথা আছে। ইহাতে বীরও নাই, তাহার অঙ্গনাও নাই ; বনবাসী রাজপুত্রের দৈহিক রূপের প্রতি লালসাময় আকর্ষণের এক অসংযত পরিচয় মাত্র আছে। এখানে রূপ দিয়া রূপকে আকর্ষণ করিবার কথা আছে। শূর্পণখা তাঁহার নিজের রূপের প্রলোভন দেখাইতেছেন—

কত যে বয়স তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি !
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি !
আই ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি

মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে !

শূর্পণখার ইহা মাত্র দেহের আবেদন, অন্তরের কোন আবেদন নহে ; সেইজন্য নিজেরই হউক কিংবা তাঁহার কল্পিত প্রণয়ীর হউক, উভয়েরই কেবলমাত্র দেহের বর্ণনাতেই তিনি পঞ্চমুখ। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপেই তাঁহার প্রেমিকের আরতি ; সেইজন্য বাহিরেই তাহার চমক—অন্তরে তাহার কোন আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই।

শূর্পণখার এই মনোভাবের মধ্যে আনুপূর্বিক কোন অসঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই, ইহাই এই কবিতাটির বিশেষত্ব ; তাঁহার প্রণয়-নিবেদন যত ঘৃণ্যই হউক, তাঁহার দিক হইতে ইহাকে সঙ্গত ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা হইয়াছে। রূপ দেখিয়া তাঁহার আকর্ষণ ; সুতরাং রূপ ও ঐশ্বর্যের অঞ্জলিতেই তিনি পূজা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার পরিচয়ের মধ্যে একটি রাক্ষস-সংস্কার আছে, তাহা বাদ দিলেও এই কবিতার মধ্যে তাঁহার যে রূপলোলুপ হিংস্র মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার রাক্ষস পরিচয়ের রূপক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহার লালসার মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহাই তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে এই দিক দিয়া সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রিকায় অর্জুনের 'অর্জুনত্ব' যেমন নাই, তেমনই দ্রৌপদীর 'দ্রৌপদীত্ব'ও নাই—ইহাদিগকে সাধারণ নায়ক-নায়িকা মাত্র বিবেচনা না করিলে অর্থাৎ ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে ইহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিলে, ইহাতে ত্রুটি প্রকাশ পাইবে। সুতরাং দ্রৌপদী এখানে সাধারণ নায়িকা মাত্র—এমন কি, তাঁহার মনোভাবের মধ্যে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব-সহধর্মিণী দ্রৌপদীর ছায়াটুকু মাত্র নাই। এইভাবে সর্বত্রই মধুসূদন তাঁহার নায়িকা চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করিয়াছেন ; সুতরাং যাঁহারা ইহার মধ্যে মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্রের বীর্য ও আত্ম-মর্যাদাবোধের সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা নিরাশ হইবেন, তাহা ত নিতান্ত স্বাভাবিক।

দ্রৌপদী এখানে বিরহিণী বা প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মাত্র—সর্বঐতিহ্যমুক্ত এই স্বাধীন মনোভাবই ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। নতুবা তাঁহার নিজেরই অপমানের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমনকারী অর্জুনের প্রতি এই গতানুগতিক নায়িকা-সুলভ মনোভাবের অভিব্যক্তির তাহার কোনই কারণ ছিল না। সুতরাং সেই দৃষ্টি দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করাই অসমীচীন। প্রবাসী স্বামীর প্রতি সন্দেহ, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি সাধারণ মানবিক গুণেরই তিনি অধীনা, তাঁহার মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কিংবা প্রবল আত্মমর্যাদাবোধের মত উচ্চ গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তিনি অর্জুনের 'দাসী' বলিয়াই সর্বদা নিজের দীনতা স্বীকার করিয়াছেন—

নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী !
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে !

এবং অর্জুনকেও তিনি রসিক নাগর বলিয়া অনুভব করেন। তিনি আশঙ্কা করেন সুরপুরে নর্তকীগণ তাঁহাকে লইয়া বিলাস জীবন যাপন করে—

কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি !
রসিক নাগর তুমি।

'রসিক নাগর' অর্জুনের যোগ্য সহধর্মিণী 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র এই দ্রৌপদী চরিত্র।

দ্রৌপদীর মনে প্রবাসী স্বামীর জন্য সর্বদাই সন্দেহ, এই সন্দেহ-জাত ঈর্ষ্যায় তিনি নিজেই জ্বলিয়া মরিতেছেন। নিত্য বসন্ত অধিষ্ঠিত নন্দন-বনে তাঁহার প্রণয়ী শত স্বর্গনর্তকী সহচর হইয়া বেড়াইতেছেন, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে ভুলিয়া আছেন। কিন্তু এই জন্য তিনি তাঁহাকে অভিশাপ দেন না, অন্তরের মধ্যে আহত প্রেম এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠে না বরং তিনি তাঁহাকেই মিনতি করেন—

অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্বাদ কর,
নমে পদে ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে !

ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনুভূতি নাই, বলিষ্ঠ আত্মবোধ নাই—শত নিপীড়ন ও অবহেলার মধ্যেও অসহায় আত্মসমর্পণ আছে। ইহা যেমন মহাভারতের দ্রৌপদীর পরিচয় নহে, তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগ্রত সমাজ মানস-জাত নারীশক্তির প্রতি বিশ্বাসেরও পরিচায়ক নহে, ইহার মধ্যে বহুদূর হইতে প্রাচীন ইতালীয় সমাজের নারীচিত্তের ক্ষীণতম একটু বেদনার্ত নিঃশ্বাস ভাসিয়া আসিয়াছে।

'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' পত্রিকাতেও একই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে—ইহার মধ্যেও যেমন মহাভারতের দুর্যোধন নাই, তেমনই ভানুমতীও নাই, ইহাতেও এক প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার নিতান্ত অসহায় মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এখানে স্বামীর যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ অর্থহীন, ইহার অর্থ বিপদসঙ্কুল পথের যাত্রী প্রবাসী স্বামী। ভানুমতীও প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মাত্র। নতুবা ভানুমতীর মধ্য দিয়া যে হৃদয়-বেদনার অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

ভানুমতী এখানে নিজেকে 'পাগলিনী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মনোভাবের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার এই পরিচয় অতিরঞ্জিত নহে। নিজের কথায়ই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—

মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দু'খানি !
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে !
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী ;

কাঁদে কুরুবধূ যত ! কাঁদে উচ্চরবে,
মায়ের আঁচল ধরি কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু !
দিবা-নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।

এই বর্ণনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালীন হস্তিনার রাজান্তঃপুরের চিত্র নহে—বরং শোকাহত বাঙ্গালী পরিবারের একটি মর্মন্তুদ করুণ চিত্র। ইহার মধ্যে দুর্যোধন কিংবা ভানুমতী কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বাঙ্গালীর ঘরের পরিচিত মুখগুলিই ইহার মধ্যে উকিঝুঁকি মারিতেছে। পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সকল ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত করিয়া ভানুমতী স্বামীকে লইয়া নিভৃতে সুখনীড় রচনা করিতে চাহেন। পুরুষের শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস নাই, নিজেরও আত্মমর্যাদাবোধ নাই। তিনি মহান অকল্যাণের ভয়ে ভীতা—

দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে !
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ !

বীরাঙ্গনার পরিকল্পনা যে তাঁহার মধ্যে কত ব্যর্থ, তাহা ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কুস্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা হইতে চম্‌কাইয়া উঠেন এবং সর্বশেষে এই মিনতি জানান—

এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব কহ ? তোষ পঞ্চজনে
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; অভাগীরে ,—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

ওভিদের পরিবর্তে মহাভারত যদি মধুসূদনের আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে দুর্যোধন-মহীষী ভানুমতীর এই শোচনীয় পরিচয় প্রকাশ পাইত না। রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতায় ভানুমতীর যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একদিক দিয়া যেমন মহাভারতের

উচ্চ আদর্শ রক্ষায় সার্থক হইয়াছে, অন্যদিকে নারীচরিত্র সম্পর্কিত বাঙ্গালীর যুগ-চৈতন্যের উপলব্ধিতেও তেমনই সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' পত্রিকার দুঃশলা চরিত্রে একই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার মধ্যেও ভানুমতীর অনুরূপ এক গতানুগতিক নায়িকা-সুলভ মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ক্ষাত্র নারীর কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি 'পোড়া কপাল', 'বিধি বাম', 'জ্ঞানশূন্য আমি' বলিয়া হা হুতাশ করিয়াছেন। তিনিও স্বামীর নিরাপত্তার জন্য অসহায় ভাবে কেবল অশ্রুপাত করিয়াই কাল যাপন করিয়াছেন। অনেক বার কাঁদিতে কাঁদিতে

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদ তলে
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে চেড়ী, পিতার আদেশে।

তিনিও নিজেকে স্বামীর দাসী বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধ কিছু মাত্র নাই, স্বামীর শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস নাই, নিজের স্বামীকে তাঁহার শত্রুর তুলনায় নিতান্তই হীন বলিয়া মনে করেন—

কাল অজগর গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে?

অতএব তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিতেছেন, 'ত্যজি রথ পদব্রজে এস মোর পাশে'।

এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি;
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি!

সুতরাং সাধারণ নায়িকার ব্যতিক্রম ত তাঁহার মধ্যে কিছু নাই-ই, বরং তাহা হইতেও নীচ কাপুরুষতার উপাদানে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আর একটি পরিচয় আছে—তিনি শিশু-সন্তানের জননী; এই পরিচয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আর কোন নায়িকা চরিত্রের

নাই। সুতরাং তাঁহাকে বাঙ্গালী জননীসুলভ সন্তান বাৎসল্য ও স্বামীর নিরাপত্তার জন্য এই শোচনীয় অবমাননা স্বীকার করিবার প্রেরণা দিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। সন্তানের কথা উল্লেখ করিয়া দুঃশলা যে এখানে বলিয়াছেন—

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি, মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি।
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে, পিতৃস্নেহ হায়রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই গুণেই দুঃশলা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ওভিদের অনুকরণ-জাত, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী'র পত্রিকাটি যে বিশেষত্বপূর্ণ, তাহা পূর্বে একবাব আলোচনা করিয়াছি। ইহার মধ্য দিয়াই মধুসূদন ইতালীয় কবি ওভিদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। একদিক দিয়া মহাভারতের জাহ্নবী চরিত্রের উচ্চ আদর্শ, আর এক দিক দিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত নবজাগ্রত মনোভাব এবং সকলের উপর মধুসূদনের জননী চরিত্রের প্রভাব ইহার পরিকল্পনার মূলে সক্রিয় ছিল বলিয়া ইহা একটি বিশেষ শক্তিশালী চ' ত্র রূপেই সৃষ্টি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই কথা সত্য, ইহার মধ্যে রক্তমাংসের মানবীয় অনুভূতির অভাব আছে; ইহা উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানবীয় সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং ওভিদের কাব্যই হউক, কিংবা মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অন্যত্রই হউক, ইহাদের প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন মানবীয় অনুভূতির সুকোমল স্পর্শলাভ করিয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে ততটা সজীব বলিয়া বোধ হইবে না। 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী'তে জাহ্নবীর চরিত্রের মধ্য দিয়া মহাকাব্যের চরিত্র-গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, গীতিকবিতার অনুভূতি-গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' নামক কবিতায় যেমন স্বর্গের অপ্সরাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

তুমি কারে কর' না প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক।

জাহ্নবীর মধ্যেও এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পত্নীরূপে যাঁহার সংসারে বাস করিয়া তাঁহার ঔরসজাত আটটি সন্তানের জন্মদান করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র একটি 'স্বর্গীয়' কর্তব্য পালন করিবার জন্যই মর্ত্যলোকে আসিয়াছিলেন এবং সেই কর্তব্য পালনের শেষ মুহূর্তেই স্বামীকে এত সহজে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহা উচ্চ নীতিকথা, কাব্যের কথা নহে। জাহ্নবীর প্রতি শান্তনুর মনোভাব জানিয়াও জাহ্নবী তাঁহাকে এত সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন—

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে!

* * * *

পূর্ব কথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেন্দ্র নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!

কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন দ্বিধা নাই শান্তনুর মুখের দিকে তাকাইয়াও কোন সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল না, সুদীর্ঘ সংসারবাসের মধ্য দিয়া যে দাম্পত্য জীবন তাঁহারা যাপন করিয়াছেন, তাহা যে কত গভীর হইয়া উঠিয়াছিল, শান্তনুর ব্যবহারেও ত তাহা প্রমাণিত হয়; তাহা স্মরণ করিয়াও জাহ্নবীর কণ্ঠস্বর মুহূর্তের জন্য কম্পিত হইল না—এই আচরণ দেবতারই সম্ভব, মানুষের দ্বারা সম্ভব নহে। কিন্তু মানুষকে লইয়াই কাব্য, দেবতাকে লইয়া পুরাণ। মধুসূদন জাহ্নবীর চরিত্রটি এখানে অনেকখানি কাব্যের ধূলিমলিন জগৎ হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকার উর্বশীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই—ইহাতে উর্বশীর বারাঙ্গনা-সুলভ মনোভাবের অভিব্যক্তি থাকিলেও প্রেমের প্রগাঢ়তার কোন পরিচয় নাই। এখানে দেহজ-কামনা প্রেমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। নির্লজ্জ ভাষায় বারাঙ্গনা উর্বশী প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না—

মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি!

যে অনুভূতির গুণে বারাঙ্গনার প্রেমও ত্যাগ এবং দুঃখ-সহনশীলতার ভিতর দিয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে পারে, এখানে তাহার বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না।

উর্বশী লজ্জাহীনা; প্রকাশ্য দেবসভায় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অভিনয়-শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া তিনি রাজা পুরূরবার প্রতি তাঁহার অনুরাগেব কথা প্রচার করিলেন, তাহার ফলে তিনি অভিশপ্ত হইলেন। এই অস্থির-চিত্ততাই তাঁহার ধর্ম। প্রেম নরনারীর হৃদয়কে যে স্থৈর্য ও প্রশান্তি দান করে, তাহা তাঁহার নাই—কারণ, তাঁহার মধ্যে লালসারই বাসা, প্রেমের নীড় সেখানে রচিত হইতে পারে নাই। তথাপি তিনি নিজেকে পুরূরবার দাসী বলিয়াই অনুভব করিয়াছেন—শূর্পণখার মত রূপ এবং ঐশ্বর্যের কথা তুলিয়া রাজাকে আকর্ষণ করিতে যান নাই। এই দীনতার অনুভূতিটুকু তাঁহাকে মানবিক গুণে ভূষিত করিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেও বারাঙ্গনা-সুলভ আন্তরিকতার যে অভাব আছে, তাহাও একেবারে অস্পষ্ট হইয়া নাই—

ও চরণে রত
এ মনঃ! উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি!
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব

তপঃ তপস্বিনী বেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে,

কিন্তু ইহা বারাঙ্গনার বাক্-চাতুরী মাত্র, এই অন্তরস্পর্শহীন বাক্-চাতুর্যই এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। বলাই বাহুল্য যে, ইহাতেও বীরাঙ্গনা কেহ নাই, রূপ দেখিয়া রূপ-বিলাসিনীর আত্মসমর্পণের অভিনয়ের কথাই আছে মাত্র। ইতালীয় কবি ওভিদের প্রভাব ইহার উপর সক্রিয় বলিয়া অনুভব করা যায়।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সর্ব শেষ সর্গের নাম 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'; কেবল মাত্র ইহারই মধ্যে একটি বীরাঙ্গনা চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আর কোথাও ইহার অনুরূপ একটিও চরিত্র নাই। কিন্তু এই চরিত্রটিরও ত্রুটি আছে, তাহার ফলে ইহার যে শ্রদ্ধা প্রাপ্য ছিল, তাহা ইহা লাভ করিতে পারে না। সে কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি।

মহাভারত কিংবা ভারতীয় ইতিহাস—ইহাদের মধ্যে বীর নারী চরিত্রের অভাব নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের সামাজিক জীবনের যে ভাবে গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা অনুসরণ করিয়া এই শ্রেণীর চরিত্র জাতির চিন্তার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে চিন্তার যে জড়তা দীর্ঘকাল যাবৎ জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহা দূর হইয়া গেল, তাহাতেই নবীন প্রাণ লাভ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের বহু অবজ্ঞাত উপকরণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিয়াছিল। রাজপুত নারীর আত্মবিসর্জন, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্ব ইত্যাদির কাহিনী বাঙ্গালী পাঠককে আকৃষ্ট করিল এবং সেই পথই অনুসরণ করিয়া 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকার জনা চরিত্রের জন্ম হইল। কিন্তু মধুসূদনের সম্মুখে আর একটি প্রাচীন আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহা ইতালীয় কবি ওভিদের নারী সম্পর্কিত মনোভাব—তাহা তিনি এখানে সম্পূর্ণ জয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেইজন্য জনার চরিত্রের

মধ্যে উচ্চ ক্ষাত্র-গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াও তাঁহার হীন মনোভাব হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। উচ্চ ক্ষাত্র নীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াও জনা মহাভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নারীচরিত্রগুলিকে নিতান্ত হীন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি জননী এবং সম্রাজ্ঞী এই মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া ইতর ভাষায় অন্যান্য কয়েকটি নারীচরিত্রের প্রতি যে অন্যায় কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের গৌরব অনেকখানি লাঘব হইয়াছে। একদিকে প্রাচীন ইতালীয় নারী-জীবনের সংস্কার, অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নারী সম্পর্কিত উচ্চতর মনোভাব—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যর্থতার জন্য ইহার পরিকল্পনা যথার্থ বীরাঙ্গনাতেও উন্নীত হইতে পারে নাই। জনার মধ্যে পুত্রশোকোন্মাদনার ভার্ব তাঁহার চরিত্রের একটি সুস্থ পরিচয় প্রকাশ করিবার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। তথাপি এ'কথা সত্য, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একাদশটি স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে কেবল মাত্র জনা-চরিত্রের মধ্যেই বীরাঙ্গনার ভাবটি নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ ছিল। এখানে ইতালীয় কবি ওভিদকে আদর্শ করিবার কোন কারণ ছিল না বলিয়া মধুসূদনের নারীসম্পর্কিত যুগোচিত মনোভাব ইহার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতে পারিত। কিন্তু মধুসূদন ইহাতেও ওভিদের প্রভাব অতিক্রম করিতে ব্যর্থ হইবার জন্য ইহার পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সুযোগটুকুর সন্ধান পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

৯

নামকরণ

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার এক বৎসর পর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচিত হয়। সুতরাং এই কথা মনে করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র নামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যের'ও নামকরণ করিয়াছেন। তবে 'অঙ্গনা' কথাটি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' হইতেই আসিয়া থাকিলেও 'বীর' কথাটি যে ইতালীয় কবি ওভিদের The Heroides-এর hero কথাটিরই প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। The Heroides-এর ইংরেজি সংস্করণে Epistles of the Heroines কথাগুলিও এই কাব্যের বিকল্প শিরোনামারূপে গৃহীত হইয়াছে। মধুসূদন Heroines কথাটিরই প্রতিশব্দরূপে বীরাঙ্গনা কথা ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। 'অঙ্গনা' শব্দটি তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কে পূর্বেই ব্যবহার করিয়াছিলেন, শব্দটি হয়ত তাঁহার কানে লাগিয়া গিয়াছিল, নারী অর্থে অঙ্গনা শব্দটি তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য heroines বুঝাইতে অঙ্গনা শব্দটিই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইহার আর কোনও তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন শব্দ-রসিক কবি। আমরা ইতিপূর্বেও দেখিয়াছি, তিনি শব্দের কেবল ধ্বনিগুণের জন্য অর্থ এবং ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য বিসর্জন দিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানেও অঙ্গনা শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধানের পরিবর্তে ইহার বিশিষ্ট ধ্বনিগুণটি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; সেইজন্য তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও যেমন তাহা ব্যবহার করিলেন, তেমনই পরবর্তী রচনা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও তাহা অনুসরণ করিলেন। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, সাধারণ নারীবাচক শব্দ যেমন কামিনী, রমণী,

সতী, সাধ্বী প্রভৃতি দ্বারা নারীর স্বাতন্ত্র্য ও বীর্য প্রকাশিত হয় না ; সেইজন্য নারীর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের গুণ বুঝাইতেই মধুসূদন 'অঙ্গনা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কতকগুলি অন্তরায় আছে। অঙ্গনা শব্দটি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকার মধ্যে কি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই প্রথম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধা চরিত্রে কোন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় নাই। বিরহিণী রাধিকা সেখানে একান্ত কৃষ্ণগত-প্রাণা, তাঁহার কোন স্বাধীন সত্তা নাই। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মধুসূদন রাধিকা চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের কোন গুণ ফুটাইয়া তুলিতেও চাহেন নাই ; পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা ঐতিহ্য অনুসারী রচনা—ইহার আত্মায় জাতীয় নবজাগরণের কোন প্রেরণা নাই। সুতরাং নারী সম্পর্কিত বিশিষ্ট কোন চেতনা লইয়া রাধা চরিত্র সেখানে যেমন চিত্রিত হয় নাই, বিশেষ অর্থগত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও সেখানে 'ব্রজাঙ্গনা' নাম ব্যবহার করা হয় নাই। বিশেষত 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'রও কেবলমাত্র দুইটি চরিত্র বাদ দিলে অবশিষ্ট নয়টি নারীচরিত্রই একান্ত নর-নির্ভর, ইহারা প্রত্যেকেই 'দাসী' হইয়া প্রণয়ীদিগের সেবা করিবার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইয়াছেন।

সুতরাং মধুসূদন নারীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করিবার জন্য তাহাদের কোন নর-নির্ভর সংজ্ঞা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে 'অঙ্গনা'র মত স্বাধীন গুণনির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, একথা স্বীকার করা যায় না। এই কাব্যে আদ্যোপান্ত কোন সার্থক বীর-নারীর চরিত্র নাই, একমাত্র জনার মধ্য দিয়া যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও দোষমুক্ত নহে। সুতরাং এই কাব্যের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' নামকরণ অর্থহীন। বীরাঙ্গনা বলিলে বীর-নারী যেমন বুঝায়, বীরের পত্নীও বুঝায়। কিন্তু এই কাব্যে বীর নারী যেমন নাই, তেমনই সকলে

বীরের পত্নীও নহে। এমন কি, যে তুই একজন বীরের পত্নীও আছেন, তাঁহাদের পতিদের বীরত্বের প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় ইহাতে নাই, কেবল নায়িকার মুখের বর্ণনায় তাহাদের বীরত্ব প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাও কার্যকর (effective) বলিয়া মনে হইতে পারে না। অতএব 'ব্রজাঙ্গনা'র সূত্রেই এখানে 'বীরাঙ্গনা' আসিয়াছে, অন্য কোন গূঢ় তাৎপর্যের জন্য আসে নাই।

এই বিষয় সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

'গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় বীরাঙ্গনা নাম সম্বন্ধেও মধুসূদন ওভিদের অনুসরণ করিয়াছেন, বীরাঙ্গনা শব্দটি শুনিবা মাত্র আমাদিগের সমরাঙ্গন-বিহারিণী রাণী তুর্গাবতীর অথবা ঝান্সী রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর ন্যায় রমণীকে স্মরণ হয়। কিন্তু মধুসূদন বীরাঙ্গনা শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। সাধ্বী পেনিলোপ (Penelope), কলঙ্কিনী ক্যানেস (Canace) এবং প্রেমোন্মাদিনী দিদো (Dido) ইহাদের প্রত্যেকেরই পত্র ওভিদ বীর-পত্রাবলী "Heroic Epistles" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুসূদনও তাঁহার আদর্শে কলঙ্কিনী তারা, পতিগতপ্রাণা দেবী রুক্মিণী এবং তেজস্বিনী জনা, ইহাদের সকলকেই বীরাঙ্গনা নাম প্রদান করিয়াছেন।'

এই উক্তির মধ্যেও ওভিদের কাব্যের নামকরণ হইতেই যে বীর কথাটি আসিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি আছে; অঙ্গনা কথাটি যে কি ভাবে আসিয়াছে, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং ইহার আর কোন তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'

(১৮৬৬)

১

সনেট ও গীতিকবিতা

সনেট পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকৃতি। ইতালী দেশে ইহার উদ্ভব হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীয় নবজাগরণের কবি পেত্রার্কাই ইহাকে একটি বিশিষ্ট সুগঠিত সাহিত্যরূপ দিয়া ইহার প্রথম প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই সনেট লিখিত হয়, কিন্তু পেত্রার্কার সনেটকেই বিশুদ্ধ সনেটের আদর্শ বলিয়া সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়। পেত্রার্কার সনেটের বিষয়বস্তু প্রেম—ইহা স্বর্গীয় কিংবা দিব্য প্রেম নহে, সাধারণ মানুষের মর্ত্য প্রেম। পেত্রার্কার রচনায় ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিক মর্ত্যবাসী মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী সুস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার সনেটের মধ্যেও মানুষেরই দেহাশ্রিত প্রেমানুভূতি অপূর্ব গরিমায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে শত শত কবি তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া মর্ত্য প্রেমানুভূতির মধ্যে স্বর্গের স্বাদ অনুভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ডাকঘর' নাটকে বলিয়াছেন, প্রেমই মর্ত্যের সুধা। পেত্রার্কা তাঁহার সনেটের ভিতর দিয়া মর্ত্যের এই সুধা বিতরণ করিয়াছেন। সেইজন্য ইউরোপীয় নবজাগরণের যুগে মর্ত্যলোক ও মানব-সমাজের প্রতি মমতায় যখন জাতির হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তখন পেত্রার্কার কাব্য প্রত্যেকেরই জাতীয় চেতনায় মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল।

পেত্রার্কার সনেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাবটি গীতিকবিতার ভাব, অর্থাৎ প্রেম ; কিন্তু গীতিকবিতার যে একটি স্বাধীন স্ফূর্তির অবকাশ আছে, ইহার মধ্যে তাহার অন্তরায় আছে। গঠনের সুদৃঢ় কঠিনতা ভেদ করিয়া ইহার অন্তরাশ্রিত ভাবটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না—গীতিকবিতার প্রত্যক্ষ প্রকাশের গুণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। সনেটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অন্যতম সার্থক সনেট লেখক প্রমথ চৌধুরী একটি সনেটেই বলিয়াছেন—

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্তে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ !
নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিত বুঝে মূর্খে লাগে ধন্ধ
ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।
ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ,—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।

সনেটের চৌদ্দটি মাত্র পদ, ইহা দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত— আটটি পদ লইয়া ইহার প্রথম বিভাগ, অবশিষ্ট ছয়টি পদ লইয়া ইহার দ্বিতীয় বিভাগ, ইহারা যথাক্রমে অষ্টক ও ষষ্ঠক নামে পরিচিত। দুইটি বিভাগে পদান্তে মিল দিবার রীতি স্বতন্ত্র এবং তাহাদের মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। অষ্টকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কবিতার ভাবটি অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিবে, তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। ভাব যত উচ্চ কিংবা গভীরই হউক, কিংবা ইহার যে বিস্তারই থাকুক, মাত্র আটটি পদের মধ্য দিয়াই

তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, অতএব ষষ্ঠকের মধ্য দিয়া তাহার ছেদ বা পরিণতি টানিয়া দিতে হইবে। কখনও কখনও অষ্টকের পরবর্তী আরও দুইটি যুগ্মপদ স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া তাহার মধ্য দিয়া ভাবের একটি ক্ষুদ্র আবর্ত সৃষ্টি করা হয়। এই সকল সুকঠিন শাসনের নির্দেশ মানিয়া লইয়া সনেট রচিত হয়। সাধারণ গীতিকবিতায় গঠনগত কোন শাসন স্বীকার করা হয় না, কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব গীতিকবিতায় সহজ অভিব্যক্তি লাভ করে মাত্র। সনেট রচনায় যে সংযম ও শিল্পদৃষ্টির প্রয়োজন, সাধারণ গীতিকবিতা রচনায় তাহার প্রয়োজন হয় না; অথচ গঠনগত এই সুকঠিন শাসন থাকা সত্ত্বেও সনেটও গীতিকবিতা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। তবে গীতিকবিতা সাহিত্যের আদি সৃষ্টি; এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিরক্ষর সমাজেও মৌখিক সাহিত্য রচনার যে ধারা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও গীতিকবিতার অস্তিত্ব আছে। গীতিকবিতার ধারা অনুসারী রচনা হইলেও সনেটে পরিণত শিল্পিমনের স্পর্শ অনুভব করা যায়; সেইজন্য সমাজ-মানসে শিল্পের আদর্শ ও প্রয়োগ-ক্ষমতা পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সনেটেরও আদর্শ-রূপটি পরিবর্তিত হইয়াছে—ক্রমে কোনও কোনও জাতির সাহিত্যে কেবলমাত্র চতুর্দশটি পদ সম্বলিত কবিতারূপেই ইহার অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে—গঠন পদ্ধতিতে যেমন ইহার মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়াছে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও তেমনই ইহা নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছে, সনেট নামের পরিবর্তে তখন ইহার পরিচয় কেবলমাত্র 'চতুর্দশপদী কবিতা' মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ইহার বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

গঠনগত নিয়মের কতকগুলি সুকঠিন নির্দেশ ইহাতে পালন করা হয় বলিয়া ইহার গীতিকবিতার ধর্ম কতদূর ক্ষুণ্ণ হয়, কিংবা ইহা গীতিকবিতা বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে কি অন্তরায়, এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই।

তবে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতার একটি অখণ্ড রস সার্থক সনেট মাত্রেরই ভিতর দিয়া যে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। গীতিকবিতার বিস্তার ও রচনাগত স্বাধীনতার মধ্যে কবিচিত্তের যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের অভিব্যক্তি হয়, ইহার মধ্যে তাহাই সংহত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। ভাবের যেখানে দৈন্য, সেখানে গীতিকবিতা রচনা সম্ভব হইলেও, সনেট রচনা সম্ভব নহে; কারণ, কোন বিষয়ের বিস্তার না থাকিলে তাহা সংহত করাও সম্ভব হয় না। যেখানে ভাব ও বিষয়গত দৈন্য দেখা যায়, সেখানে সনেটের সীমায় তাহা উন্নীত করা যায় না; যেখানে বিস্তার ও প্রাচুর্য, সেখানেই কেবলমাত্র সংহত করিবার কথা উঠিতে পারে। সুতরাং সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের সকল বিষয়েই পার্থক্য—কেবলমাত্র মাত্রাগত, মৌলিক বিষয় কিংবা ভাবগত পার্থক্য নহে। সনেটের আর একটি প্রধান গুণ, ইহার আত্মভাবপরায়ণতা (subjectivity), ইহা বস্তুধর্মী, বিশ্লেষণাত্মক কিংবা বর্ণণাত্মক নহে, ইহা কবির একান্ত আত্মমুখী রচনা; উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম; সুতরাং এই গুণেও সনেট গীতিকবিতার ধর্ম হইতে বঞ্চিত নহে। গীতিকবিতারই বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পোচিত পরিমার্জনা ও সংক্ষিপ্ততা লাভ করিয়া বিদগ্ধ জনের জন্য সনেটের সৃষ্টি হয়। গীতিকবিতা সহজভাবেই হৃদয় স্পর্শ করে, সনেট মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া গিয়া হৃদয়ে পৌঁছায়; সুতরাং উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র হইলেও লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

সনেট একান্ত ভাব-কেন্দ্রিক রচনা, ইহাতে বাহিরের উপকরণ কিংবা বস্তুর বাহুল্য থাকিলে নিতান্ত অল্পপরিসর রচনার মধ্যে ইহার ভাবানুভূতি নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না; বহির্বিশ্ব কবির দৃষ্টিতে যেখানে লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবল মাত্র অন্তরের অনির্বাণ দীপশিখাটি প্রকাশমান হইতে পারে, সেখানেই সনেট রচনার সার্থকতা। ইহার রচনার মধ্যে শাসন এত কঠিন ছিল বলিয়া পরবর্তীকালে নানা দিক দিয়া ইহার ব্যতিক্রমও দেখা দিতে লাগিল। গীতিকবিতা মানুষের জ্ঞান বিকাশের

প্রথম লগ্ন হইতেই বিকাশ লাভ করিয়া যেমন আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, ভাবকেন্দ্রটিকে স্থির রাখিয়া বহিরঙ্গে যুগোচিত পরিমার্জনা স্বীকার করিয়া ইহার প্রাণশক্তিরক্ষা করিয়াছে, সনেটের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; কারণ, যেখানে নিয়মের নিগড়, সেখানেই অনিয়মের বাসা আপনিই বাঁধিয়া উঠে; ক্রমে তাহার ভিতর দিয়া ইহার প্রথমত আদর্শচ্যুতি এবং পরিণামে বিনাশ দেখা যায়। পেত্রার্কার পরবর্তী কালে তাঁহার আদর্শকে নিখুঁত ভাবে অনুসরণ করিয়া কোন দেশেই যে সার্থক সনেট রচিত হইতে পারে নাই, ইহাই তাহার কারণ।

কিন্তু সনেটের বন্ধন কেবল মাত্র ইহার দেহেরই বন্ধন নহে—ইহার আত্মারও বন্ধন। এই সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন. 'বন্ধন শুধু বাহিরের বা দেহের নয়—আত্মারও বটে; সেই আত্মার স্ফূর্তিও যত অধিক, বন্ধনের এই কঠিন পীড়নে তাহার দীপ্তিও তত অধিক। এ'জন্য, সনেটের ভাব-বস্তু আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গভীরতায় ক্ষুদ্র হইলে চলিবে না—স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত তাহাকে যতই চাপিয়া ছোট করা হয়, ততই তাহার বেগ যেন বৃদ্ধি পায়; সেই অতি প্রবল ও গভীর আবেগকে সংযত করিয়া, তাহাকে আরও দীপ্তিশালী করিবার জন্যই সনেটের এই নাগপাশের প্রয়োজন। অনুষ্টুপ ছন্দ যেমন অপার করুণার আবেগে জন্মলাভ করিয়াছিল, আদি-সনেটও তেমনই প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। পরবর্তী যুগের ইতিহাসেও প্রেমই ছিল ইহার প্রধান বিষয়-বস্তু; এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমই ইহার একমাত্র বিষয় না হইলেও—খুব গভীর আবেগ, ভাব ও ভাবনা সনেট-কবিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে; বৈঠকী আলাপের রসিকতা, কৃত্রিম কল্পনা-বিলাস বা তরল ভাবোচ্ছ্বাস সনেটের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় নাই।'

২

সনেট ও 'চতুর্দশপদী কবিতা'

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের যে সকল বিভিন্ন রূপ বাংলা সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করে, সনেট তাহাদের অন্যতম। মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে ইহার বহিরঙ্গ-রূপটির প্রবর্তক; কিন্তু ইহার আত্মাটির মধ্যে যে ইহার বিশিষ্ট পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তিনি কতদূর তাঁহার রচিত এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই বিচারের বিষয়। কারণ, আত্মার পরিচয়ই যথার্থ পরিচয়, বাহিরের পরিচয়ে যে সৌষ্ঠবই থাকুক, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে না পারিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত তাহার কোন মূল্য নাই। বিশেষত বহিরঙ্গগত রূপটির অনুকরণ করা যত সহজ, অন্তরাত্মার সন্ধান পাওয়া তত সহজ নহে; এমন কি, সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন না হইলেও ইহাকে দেশান্তরের সমাজ, ভাষা ও রস-সংস্কারের মধ্যে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা সর্বদা সহজসাধ্য নহে। এক একটি জাতির সুদীর্ঘ রস-সংস্কার অনুসরণ করিয়া সাহিত্যের এক একটি রূপের এক এক দেশে বিকাশ হইয়া থাকে। প্রাচীন ইতালীয় জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ রস-সংস্কারের ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার বিশেষ একটি যুগে ইহার নিজস্ব জাতীয় কবি-চেতনায় সনেটের মত রস-বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছিল; ইহার আত্মার প্রতিটি সূক্ষ্মতম শিরা উপশিরা, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই জাতির রস-লোকে বিধৃত। সুতরাং স্বতন্ত্র পরিবেশে ইহার বহিরঙ্গের অনুকরণ করিতে গিয়া সর্বদাই যে অন্তরাত্মার উপলব্ধি এবং তাহার অভিব্যক্তিও সার্থক হইবে, এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। মধুসূদন তাঁহার কতকগুলি খণ্ড গীতিকবিতাকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতালীয় ভাষায় সনেটের প্রবর্তক কবি পেত্রার্কার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারই আদর্শে সনেট রচনার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন ইউ-

রোপীয় কবিদিগকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস মধুসূদনের সর্বত্রই যে সার্থক হইয়াছে, তাহা বলা যায় না ; সুতরাং এখানেও যে তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যথার্থই পেত্রার্কীয় আদর্শে সনেট পদবাচ্য কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই, তাঁহার এই অনুকরণ যে কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দেখা যায় যে, সনেট রচনায় যে মধুসূদন কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, এই বিষয়ে বাঙ্গালী সাহিত্য-সমালোচকগণ একমত নহেন। মধুসূদনের জীবনীলেখক স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, ' 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সৌন্দর্যে মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট।' তাঁহার মতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাঁহার কাব্য-কীর্তি,—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' 'তাঁহার জীবন-কথা', ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। আধুনিক কালে মোহিতলাল মজুমদারই মধু-প্রতিভার সার্থকতম বিশ্লেষণকারী ; তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন, 'সনেট কাহাকে বলে, সে জ্ঞান আজও অনেকের নাই ; সনেট কেবল চতুর্দশপদী কবিতাই নয়—একটি সহজ সরল ভাব বা চিন্তাকে উপমা-অলঙ্কার সাহায্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পদে আবেগ মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা সর্বোৎকৃষ্ট সনেট হয় না ; ছন্দোবন্ধের দুরূহ কারিগরির মধ্যে এবং স্বল্প পরিসর বাগ বন্ধের গাঢ়তায়, ভাব অতিশয় আবেগ-গভীর হইয়া উঠে বলিয়াই সনেট নামক কবিতা এত মহার্ঘ হইয়াছে। এই সকল ধারণা যাঁহাদের নাই, তাহারাই মধুসূদন মহাকবি বলিয়া, তাঁহার সর্ববিধ কাব্যচর্চাকে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিয়া থাকে।' এমন কি, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য গীতিকাব্য রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের সার্থকতার কথা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 'সনেট' রচয়িতা হিসাবে নহে। তিনি এই পর্যন্ত লিখিতে পারিয়াছেন যে, 'মহাকাব্য রচনায় মেঘনাদবধের কবি হিসাবে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, গীতিকাব্য রচনায় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র

কবি হিসাবেও তাঁর সাফল্য তার চেয়ে ন্যূন নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাকাব্যের ধারা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অর্ধসফল অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে ; কিন্তু বিষয়াবলম্বন, রীতি ও কলাকৃতির দিক দিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি যে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন, পরবর্তী কালে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রমুখ উত্তর-সূরিবৃন্দের সার্থক সাধনার মধ্যে তা নব নব সাফল্যের নিত্য প্রেরণা হয়ে উঠেছে (পৃঃ ১১০-১১)।' সুতরাং উল্লিখিত গ্রন্থে সনেটের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইলেও মধুসূদন যে সার্থক সনেট রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই কথা উপরের উদ্ধৃতিতে দাবী করা হয় নাই। তিনি যে আধুনিক 'গীতিকাব্য' ধারার প্রবর্তক তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র ; গীতিকাব্যমাত্রই যে সনেট নহে তাহা সকলেই বুঝিতে পারে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে পেত্রার্কীয় সনেটের বহিরঙ্গগত রূপ যত নিষ্ঠার সঙ্গেই রক্ষা করিবার প্রয়াস দেখা যাক না কেন, ইহার আত্মার মধ্যে যে ইতালীয় সনেটের প্রেরণা সঞ্চার করা সম্ভব হয় নাই, সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে যাঁহাদের সাধারণ পরিচয় আছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। প্রেম পেত্রার্কীয় সনেটের উপজীব্য। ইউরোপের নব জাগরণের যুগেও ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সনেট রচিত হইয়াছিল—কিন্তু পেত্রার্কার জীবন ও শিল্পবোধ সকলের ছিল না, থাকিবার কথাও নহে—সেইজন্য নূতন নূতন যুগে নব নব কবির রচনায় ইহাদের মধ্যে রূপ ও ভাবগত কিছু বৈচিত্র্যও যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেইজন্য সর্বদেশেই পেত্রার্কার আদর্শেই সনেট রচিত হইয়াছে, এই কথা দাবী করা যায় না। সনেটের একটি বিশেষ গুণ গীতি-ধর্মিতা (lyricism), একটি বিশিষ্ট বহিরঙ্গরূপের মধ্যে তাহা সর্বত্র রক্ষা পাইলেও, ইহার যে একটি অপরিহার্য গুণ, ইহা প্রেমভিত্তিক, তাহা রক্ষা না পাইলে তাহাকে সনেট আখ্যা দেওয়া কতদূর সঙ্গত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কোন বিশেষ রচনা চতুর্দ্দশপদী কবিতা হইতে পারে, কিন্তু সেই গুণেই ইহা সনেট হইতে পারে না।

মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র চুরানব্বইটি কবিতার মধ্যে কোন কবিতারই বিষয়-বস্তু প্রেম নহে। ইহার বিষয়গুলি বিস্তৃত করিয়া এইভাবে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—'আত্ম-পরিচয়', 'মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি' 'সারস্বত-কথা,' 'বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি,' 'কবি ও কোবিদ-তর্পণ,' 'কাব্য রসোদগার,' 'নিসর্গ', 'পাখি', 'তত্ত্বচিন্তা'। বলা বাহুল্য যে, ইহাদের কাহারও লক্ষ্য প্রেম নহে। অথচ এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধুসূদন পেত্রার্কার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি একটি কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন,

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত সুধার রস করি বরিষণ,
বসন্ত আমোদে মন পুরি নিরন্তরে;—
সে দেশে জনম পূর্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রান্সিকো, পেতরার্কা কবি; বাগ্‌দেবীর বরে—
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন
রসনা অমৃতসিক্ত স্বর্ণ-বীণা-করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিল বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসন্নভাবে গ্রথিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী পদ উপযুক্ত গণি
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শে সনেট রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; এমন কি, কোন ইংরেজ কিংবা অন্য দেশীয় কোন পরবর্তী সনেট লেখকও তাঁহার আদর্শ ছিল না। ইতালী দেশে সনেট রচনা যাঁহার মধ্যে সর্বপ্রথম সার্থক হইয়াছিল এবং পরবর্তী

কালে যাঁহার আদর্শ দেশ বিদেশে গৃহীত হইয়াছিল, সেই পেত্রার্কাই মধুসূদনের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, পেত্রার্কীয় সনেটের কেবলমাত্র বহিরঙ্গ গঠনই তিনি অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু যে প্রেম-বিষয়কে অবলম্বন করিবার ফলে পেত্রার্কীয় সনেটের সার্বভৌম আবেদন সৃষ্টি হইয়াছিল, বিভিন্ন বহির্মুখী বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া লিখিত হইবার জন্য মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই।

মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে বস্তুবর্ণনা মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু আদর্শ সনেট একান্ত আত্মিক অনুভূতির দ্বারা সৃষ্ট বলিয়া ইহা প্রধানত মন্ময়, তন্ময় নহে। সনেটের চেতনার মধ্যে বহির্মুখী বস্তুচেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র কবি-চিত্তের অন্তরগত অনুভূতিই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার রস যতখানি অন্তরের উপলব্ধির বিষয়, ততখানি বহির্বিশ্বের প্রত্যক্ষরূপ হইতে সন্ধানের বিষয় নহে। এই কথা সত্য, মধুসূদন আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে বস্তু বর্ণনা করেন নাই, স্বকীয় আত্মার আলোকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যে বাহিরের বস্তুর কিংবা সমসাময়িক বিষয়ের উপর ন্যস্ত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার 'বঙ্গভাষা' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় যে ঐতিহ্যপ্রীতি, দেশাত্মবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ পাক না কেন, কিংবা তাঁহার 'কমলে কামিনী' কবিতায় এ'দেশের প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের প্রতি যে ভক্তিই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা যে পেত্রার্কীয় প্রেম-বিষয়ক সনেটের মত সার্বভৌম আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া বলিলেও চলিতে পারে। পেত্রার্কীয় সনেট মধুসূদনকে যে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা ইহার সার্বভৌম অনুভূতির গুণে, আঞ্চলিক কিংবা সমসাময়িক কোনও বিষয়বস্তুর গুণে নহে। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে বাংলাদেশ, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, কবির একান্ত আত্মবিলাপ ইত্যাদিই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে মাত্র, দেশ ও কালোত্তীর্ণ কোনও সর্বজনীন মনোভাব ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত

হইতে পারে নাই। পেত্রার্কার সনেট চিরন্তন মানবের প্রেম-কথা, মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার নিজস্ব জীবন-কথা।

তবে এই কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মাত্র দুই একটি নিসর্গ-বিষয়ক কবিতায় কবি একান্ত আত্মকথা বলিবার পরিবর্তে যে সৌন্দর্য কিংবা প্রকৃতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকীয় অনুভূতির আধার হইয়াও সর্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'সায়ংকালের তারা' কবিতাটি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়—

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ'ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন, তোমার মত, কহ, সহচরি,
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সুকবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ন মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব ; ও লো বরাঙ্গনে
ক্ষণ মাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে।

কিন্তু ইহাও বহির্মুখী প্রকৃতির স্তবগান মাত্র, সনেটের মধ্যে যে ভাব-গাঢ়তার প্রয়োজন, এখানে তাহার অভাব আছে। সুতরাং দেখা যায়, মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র যতখানি গীতিকবিতার গুণ আছে, সনেটের গুণ তত নাই।

৩

আত্মকথা

কি মানসিক অবস্থায় এবং কি পরিবেশে মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী হইতে সকলেই অবগত আছেন—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের ইউরোপ যাইবার যে অভিলাষ ছিল, তাহা তাঁহার পরিণত জীবনে আসিয়া পূর্ণ হইল, তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। ব্যারিস্টারি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার ইউরোপ যাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা হইলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিতেন; কিন্তু সেই বয়সেও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ফরাসীদেশের অন্তর্গত ভারসেল্‌স্‌ নগরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবহীন প্রবাসে প্রাত্যহিক জীবনের চরম অর্থকৃচ্ছ্রতার বেদনা ও অপমানের মধ্যে বাসকালীনই তিনি তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিত্যবলী' রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য সে'দিন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অতিক্রম করিয়া গিয়া সাহিত্যের সার্বভৌম ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিষয়ক পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহার রোমান্টিক চেতনা এত শক্তিশালী ছিল যে, এপিক-ধর্মী রচনার ভিতর দিয়াও তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মত রোমান্টিক রচনার ভিতর দিয়া যে তাহা শতগুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। সেইজন্য 'চতুর্দশপদী কবিতা' তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের এক একটা বেদনার্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস, কবি-জীবনের মর্মমূল হইতে তাহা উৎসারিত। নিজের কথা এমন গভীরভাবে বলিবার অবকাশ তিনি ইতিপূর্বে আর কোথাও পান নাই। প্রতিভাশালী একটি সুমহান্‌ জীবনের ব্যর্থতার বেদনায় কবির এই জীবন-চিত্র নিতান্ত করুণ

হইয়া উঠিলেও মধ্যে মধ্যে ইহাতেও এক একবার তাঁহার চোখের সম্মুখে আশা ও আশ্বাসের বিদ্যুচ্ছটা বিকাশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা মুহূর্তেই আবার মিলাইয়া গিয়াছে। সেই মানসিক অবস্থায় মধুসূদনের পক্ষে সুদীর্ঘ কাহিনীমূলক মহাকাব্য রচনার পরিবর্তে যে খণ্ড গীতিকবিতা রচনাই স্বাভাবিক ছিল, এই সম্পর্কে মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্র-নাথ বসুর উক্তিটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, 'মধুসূদনকে যে অবস্থায় য়ুরোপ বাস করিতে হইয়াছিল, সে অবস্থায় মনের ভাব ধারাবাহিক রূপে গ্রথিত করিয়া কাব্য রচনা করা সম্ভবপর নয়। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তিনি এক একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, কিন্তু তাহার পর দৃঢ়তার ও সহিষ্ণুতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার একটি নূতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন।' এই কথা সম্পূর্ণ সত্য; বিশেষত মধুসূদনের প্রতিভা যে খণ্ড গীতিকবিতা রচনারই প্রতিভা, মহাকাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী রচনার প্রতিভা নহে, তাহা পূর্বের আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারা গিয়াছে।

মধুসূদন আত্মকথা লইয়া তাহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'উপক্রম' নামক প্রথম কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। তিনি যে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছেন, সে'কথা 'গৌড় চূড়ামণি'কে শুনাইয়াই তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার সূত্রপাত করিয়াছেন—

'সেই আমি, শুন, যত গৌড় চূড়ামণি।'

তারপর 'বঙ্গভাষা' কবিতায়ও বাংলাভাষার প্রতি যতখানি প্রশস্তি-বাচন শুনিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা তাঁহার নিজের সঙ্গে ইহার সম্পর্কের কথাই বেশি শুনিতে পাওয়া যাইবে। নিজের জীবনে যে একদিন মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহারই বেদনা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা তাঁহার নিজেরই জীবন-কথা—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর দেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।

ইহার পরও 'পরিচয়' শীর্ষক কবিতার ভিতর দিয়া তিনি নিজেরই স্বদেশ ও নিজেরই জীবনের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাস-জীবনে বাংলাদেশের 'আশ্বিন মাসে'র কথা স্মরণ করিয়াও তিনি অনুভব করিয়াছেন—

পূর্বকথা কেন ক'য়ে স্মৃতি,
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি।

আশ্বিন মাস যেমন কবির ব্যক্তিগত জীবনের পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই নিজের জন্মভূমির প্রান্তশায়ী যে ক্ষুদ্র নদটি একদিন তাঁহার কৈশোরের সহচর ছিল, তাহার স্মৃতিও তাঁহার প্রবাস-জীবনকে ব্যথিত করিয়া তুলে—

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে—
জুড়াই এ' কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?

দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।
আর কি হে হ'বে দেখা ?—যত দিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে সে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।

তাঁহার 'নূতন বৎসর' কবিতার মধ্যে নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথাই অনুভূত হইয়াছে; নিজের ব্যর্থ জীবনের দিকে তাকাইয়া নূতন বৎসরের নিকট আশা করিবারও যে তাঁহার কিছু নাই, নূতন বৎসরের প্রথম দিনে তিনি তাহাই সুগভীর বেদনার ভিতর দিয়া অনুভব করিয়াছেন—

কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল,
হায়রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে ?
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল ?

নিজের সাংসারিক জ্ঞানের অভাবের কথা তিনি তাঁহার 'সাংসারিক জ্ঞান' কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; 'অর্থ' নামক কবিতার ভিতর দিয়াও তিনি নিজের ব্যবহারিক জীবনে অর্থাভাবের মধ্যে অলস সান্ত্বনা সন্ধান করিয়াছেন।

এমন কি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁহার নিজের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার বিষয়ক কবিতাটি রচনা করিয়াছেন—

বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে !

এখানে আত্মনিরপেক্ষ হইয়া তিনি বিদ্যাসাগরের গুণ বিচার করিতে

পারেন নাই, নিজের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছেন।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুসূদন নিজের জীবনে আশার কথা কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। যে অপরিমিত আশা ও আত্মবিশ্বাস লইয়া তাঁহার বাংলা সাহিত্য সেবার সূত্রপাত হইয়াছিল, কঠিনতম জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে ও ভগ্ন মনে তাহা তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকাও তাঁহার হৃদয়কে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়াছিল—

বাড়িতে লাগিল বেলা, ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ুরূপ স্বরে,
নাহি যার কেশ-পাশে তারারূপ মণি.
চিররুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা—তপনের দূতী অরুণ-রমণী।

তাঁহার প্রতিভা যে অস্তগমনোন্মুখ এই চেতনা তাঁহার নিজের মধ্যেও তখন দেখা দিয়াছে।

নিজের কথা ভাবিয়া কিংবা সম্মুখের দিকে তাকাইয়া যেমন তিনি নিরাশ হইয়াছেন এবং এই বিষয়ক তাঁহার প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার দীর্ঘশ্বাস তিনি গোপন করিতে পারেন নাই, তেমনই জাতীয় গৌরবের কোন অতীত চিত্র দেখিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকের উল্লাসও অনুভব করিয়াছেন। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' সম্পর্কে এই আশা পোষণ করিয়াছেন—

অন্নদা-মঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।

এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি কবিতা আছে। তাহাদের কথা পরে বিস্তৃত আলোচিত হইবে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক সুখ দুঃখ ও আশা নৈরাশ্যের বিষয়

যেমন সনেটের বিষয় নহে, তেমনই গীতিকবিতারও বিষয় নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, পেত্রার্কীয় আদর্শ সনেটের বিষয় প্রেম,—ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। গীতিকবিতার বিষয়ের মধ্য দিয়া কবির আত্মচেতনা বা আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহা এক একটি সর্বজনীন বিষয় বা ভাবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, কবির একান্ত ব্যবহারিক জীবনকে আশ্রয় করিয়া নহে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে যে জীবন, তাহা মধুসূদনেরই ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবন; এমন কি, ইহার মধ্যে কবি মধুসূদনেরই জীবন যতখানি আছে, তাহা অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষ মধুসূদনের কথা বেশি আছে। যেখানে কবির নিজস্ব জীবনানুভূতি তাঁহার নিজের হইয়াও সর্বজনীন, সেইখানেই গীতিকবিতার সার্বভৌম আবেদন প্রকাশ পায়; কিন্তু যেখানে তাঁহার অনুভূতি একান্ত তাঁহার নিজস্ব জীবনের অভ্যন্ত গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত, সেখানে গীতিকবিতার চরম সার্থকতা দেখা দিতে পারে না। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে যে তাঁহার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই। গীতিকবিতা কবির ব্যবহারিক জীবন-কথা নহে, জীবনের বহির্মুখী বিষয় ইহাতে নিতান্ত গৌণ হইয়া থাকে, অন্তর্মুখী অনুভূতিই ইহার ভিত্তি হয়, এই অনুভূতি সাধারণের পক্ষে যতখানি সত্য, কবির প[ক্ষে] ততখানিই সত্য—দশজনের সূত্রেই সেই অনুভূতি কবি নিজেও লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার হয়ত তাহা অনুভব করিবার শক্তি বেশি থাকে, সেই-জন্যই তিনি কবি, কিন্তু সর্বসাধারণও তাহার সমানই অংশীদার, এই সূত্রে কবির রচনা সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে। মধুসূদনের 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী'র সেই সর্বজনীনতার গুণ নাই, ইহা তাঁহার নিজের মধ্যে, তাঁহার দেশের মধ্যে, তাঁহার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি বোধের মধ্যে সীমায়িত, সেই অনুযায়ী গীতিক[বি]তা হিসাবে ইহার রচনাও অকিঞ্চিৎকর। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র আমরা মধুসূদনকেই জানিতে পারি, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াও এক বৃহত্তর শাশ্বত যে জীবন আছে, তাহার কোন সন্ধান পাই না।

৪

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী

কবি মধুসূদন খৃষ্টানও ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না—তিনি বাঙ্গালী ছিলেন; এই বিষয়টি বুঝিতে পারিলে মধুসূদন সম্পর্কে অনেকখানিই বুঝিতে পারা যাইবে। সাম্প্রদায়িকতাবোধ কিংবা ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামি যে কবিত্ব বিকাশের অন্তরায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা শাস্ত্রের কথা কবিতা নহে,—জীবনের কথাই কবিতা; সেই জীবন শাশ্বত হইলেও তাহার একটা আশ্রয় কিংবা মুখ্য পরিচয় আছে। মধুসূদনের সেই পরিচয় তিনি নিজে যেমন বাঙ্গালী, বাংলা ও বাঙ্গালীকে লইয়াই তাঁহার কাব্য; সেইজন্য বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্গূঢ় পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাই মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা পর্যন্ত মধুসূদন তাঁহার জ্ঞানসাধনা দ্বারা দেশ-দেশান্তর হইতে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানত অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; সেই সকল উপকরণ নিঃশেষ হইয়া যাইবার যুগে প্রবাস-জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি যে ভাবে নিজের দিকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহাতেই তাঁহার স্বদেশের মহিমা তাঁহার নিকট নূতন করিয়া ধরা পড়িল। যে চেতনা তাঁহার মধ্যে অস্ফুট এবং অস্পষ্ট ছিল, তাহাই সেদিন স্ফুটতর ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেই বুঝিতে পারা গেল যে, বিদেশ হইতে সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেও বাঙ্গালী কবি-প্রাণতাকে মধুসূদন কোনদিন বিসর্জন দেন নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র নিতান্ত রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যেও বাঙ্গালীর গৃহের বেদনা এই উপমাটির ভিতর দিয়া কি অসাধারণ করুণ হইয়া উঠিয়াছে,—

একাকিনী বিরহিণী বিষণ্ণ বদনা
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'রই এই কয়টি পদে বাংলার বৈষ্ণব কবিতার সুর ও অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—

গোপিনী শুনি যেমনি মুরলির ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জ-পানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।

ইহার মধ্যেই যেমন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র জন্ম তেমনই নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'আশ্বিন মাস' কবিতাটির সূচনা দেখা যায়—

যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ মেনকা-সুন্দরী
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্র নীরে
নাচেন গায়েন সুখে।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এই দুইটি পদ যে তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'বিজয় দশমী' কবিতার জনক, তাহাও আ৺ সহজেই বুঝিতে পারা যায়—

করি স্নান সিন্ধুনীরে, বক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে,
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রেরণা বিশেষ কোন অবস্থার মধ্যে কিংবা বিশেষ পরিবেশে আকস্মিকভাবে যে দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে—তাঁহার পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে তাহার প্রেরণার অস্তিত্ব ছিল—পৌরাণিক কাহিনীকে সেখানে মুখ্য করিবার ফলে তাহার স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না;

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে তাঁহার সেই প্রেরণার তিনি স্বাধীন মুক্তি দিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার সমগ্র কাব্যসৃষ্টি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার বাঙ্গালীসুলভ মনোভাবটি উদ্ধার করা কঠিন হইবে না। এই বাঙ্গালীত্ব হিন্দুত্ব বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। হিন্দুত্বকে অতিক্রম করিয়াও বাঙ্গালীর একটি শাশ্বত মানস-প্রকৃতি আছে ; সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সবই একাকার হইয়া বাস করে, তাহা ভাবের জগৎ বলিয়া স্বার্থদ্বারা সঙ্কীর্ণ নহে, এই ভাবস্রোতে বাঙ্গালীর রসপ্রাণ চিরপ্রবহমান। ইহার উপরই বাঙ্গালীর সাহিত্যের অমর কীর্তিস্তম্ভগুলি স্থাপিত হইয়াছে—কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর তাহা স্থাপিত হয় নাই।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধুসূদনের দৃষ্টি কত গভীরভাবে বাঙ্গালীর জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল, যেমন 'বঙ্গভাষা', 'কমলে কামিনী', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কাশীরাম দাস', 'কীর্তিবাস', 'জয়দেব', 'বউ কথা কও', 'দেবদোল', 'শ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস', 'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিবমন্দির', 'কপোতাক্ষ নদ', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'শ্রীমন্তের টোপর', 'ব্রজবৃত্তান্ত' ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে এই কথা অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, ইহাদের অধিকাংশ বিষয়ই হিন্দু জীবনাশ্রিত ; সেইজন্য তিনি খৃষ্টান হইয়াও মনে মনে হিন্দুত্বের আদর্শকেই শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু এই কথা মনে করা ভুল হইবে। কারণ, বাংলাদেশের একটি অখণ্ড রূপ আছে, তাহা যে কেবলমাত্র বাঙ্গালীর অন্তরাশ্রিত অনুভূতির মধ্যেই বিরাজমান, তাহা নহে, ইহার প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেও একটি অখণ্ডতার পরিচয় প্রকাশ পায়। মধুসূদন এই কবিতাগুলির একটির মধ্য দিয়াও ধর্মের কথা কিংবা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণনা করেন নাই। 'কমলে কামিনী'র উল্লেখ করিয়া বাংলার কবি মুকুন্দরামের জন্য এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, 'এবে

কে পূজিবে তোমা মজি তব গানে ?' নব যুগের মুখে বাঙ্গালীর জাতীয় কবির যে অনাদর দেখা দিয়াছে, তাহার জন্যই তিনি বেদনা অনুভব করিয়াছেন। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' কবিতায় নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া ভবানন্দ মজুমদারকে শিক্ষা দিতেছেন—

চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে,
চঞ্চল ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ,
তবু কি সংশয় তব জিজ্ঞাসি তোমারে ?

কাশীরাম দাস ববং কৃত্তিবাসের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পুরাণ রচনা করিয়া বাঙ্গালীর জন্য স্বর্গলোক নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া নহে, বরং কাশীরামকে বলিয়াছেন—

ভাষাপথ খননি স্ববলে,
ভারত রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা এ'বিমল জলে।

এই প্রকার তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই সর্বধর্মনিরপেক্ষ একটি বাঙ্গালী জীবনসুলভ দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

শিবমন্দির সম্পর্কে যে তাঁহার দুইটি কবিতা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেও দেবতার কথা নাই ; নিশীথের নদীকূলে নিস্তব্ধ প্রকৃতির যে ধ্যানমগ্ন একটি রূপ আছে, বটবৃক্ষ তলে শিবমন্দির কিংবা দ্বাদশ মন্দির তাহার মধ্যে বিধৃত। অর্থাৎ নদীতীরে গাছপালা, গ্রাম কুটীর ইত্যাদি মিলিয়া যে একটি সামগ্রিক পটভূমিকা রচনা করে, নদীতীরের মন্দিরটিও তাহা হইতে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে। বাংলার প্রকৃতির যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহার মধ্যে নদনদী, তরুলতা, কুটীর-মন্দির সব একাকার হইয়া আছে, একটিকে বাদ দিয়া আর একটি সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং মন্দিরে দেবতার স্থান বলিয়া নহে, প্রকৃতির একটি অঙ্গরূপেই মধুসূদন ইহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সূত্রেই ইহা সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ নহে। 'দ্বাদশ শিবমন্দির' কবিতার ভিতর দিয়া শাশ্বত জীবনের

একটি সুগভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করিয়াছেন ; ধর্মের উপলব্ধির কোন কথা নাই, এই উপলব্ধি অবশ্য একান্ত বাঙ্গালীর জীবনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালী জীবনের বিজয়া দশমীর বেদনাটি মধুসূদনের কবিমন গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল। এই বেদনা যে বাঙ্গালী মাত্রেরই একটি সার্বভৌম বেদনা, তাহা কবি নিজের জীবন সূত্রেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইজন্য যে বেদনার ভাষা নাই, সেই বেদনা বুঝাইতে মধুসূদন বিজয়া দশমীর চিত্রটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিজয়ার বেদনার অনুভূতি দিয়াই যেমন তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপসংহার করিয়াছেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উপসংহারেও এই চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার জীবন-সাধনার এখানেই সমাপ্তি—

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি
ও প্রতিমা, নিবাইল, দেখ হোমানলে,
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি।

তারপর তিনি 'বিজয়া দশমী' নামক একটি পূর্ণ চতুর্দশপদী কবিতাতেও এই ভাবটির একটি সার্থক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, মধুসূদনের মানস-লোকের ইহা একটি চির-ভাস্বর ধ্রুব নক্ষত্র—

'যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে—
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে ?

দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে ; আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।'—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরিশের রাণী।

ইহার ভিতর দিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মাতৃ-হৃদয় যেন অশ্রুমোচন করিতেছে। বাঙ্গালীর হৃদয়ের মর্মস্থলটুকু যে কি ভাবে মধুসূদন সন্ধান করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, ইহা হইতে সার্থক পরিচয় তাঁহার কাব্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহারও কথা বাৎসল্য, ধর্ম নহে—ইহার বক্তব্য যদি ধর্ম হইত, তবে ইহার মধ্যে এত শক্তি প্রকাশ পাইত না।

ফরাসী দেশে আশ্বিনের আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় দেখিয়া কবির বাঙ্গালী গৃহের কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার কথা মনে পড়িয়াছে। মধুসূদন কিসে কবি হইয়াছেন, এইখানেই তাহার সব চাইতে বড় প্রমাণ। ইউরোপের প্রতি যে আকর্ষণ বশতই তিনি প্রবাস যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই আকর্ষণ যে তাঁহার গৃহের আকর্ষণ হইতে বড় ছিল না, এই কবিতাটিই তাহার প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন,

হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে ;
থাক বঙ্গগৃহে যথা মানসে, মা' হাসে
চির রুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ, সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে,
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গাহ্রদে।

বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত 'বউ কথা কও' পাখীর সুপরিচিত ডাকটি তিনি ফরাসী দেশের প্রবাস-জীবনের মধ্যেও কল্পনায় শুনিতে পাইয়াছেন। সে'দিন ফরাসী দেশের যে প্রকৃতি তাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহাকে তিনি অপ্রত্যক্ষ করিয়া সুদূর জন্মভূমির অদৃশ্য প্রকৃতিকে তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। সুদূর ইউরোপের

প্রবাস-জীবনে বাস করিয়াও কল্পনার সূত্রে তিনি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির সঙ্গে সুনিবিড় যোগ অনুভব করিয়াছিলেন, সে যোগ মুহূর্তের জন্যও তাঁহার মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের কোন স্থাপত্য কীর্তি অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া কালজয়ী হয় নাই, কিন্তু ইহার মানস-লোকে যে কীর্তি-স্তম্ভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর হইয়া আছে। অতীত ইতিহাসের লোকে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র বাঙ্গালীর জন্য সেই অমর কীর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, পাশ্চাত্ত্য সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ ভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশে বাস করিয়াও মধুসূদন যে তাহা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার 'শ্রীমন্তের টোপর', 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কীর্তিবাস', 'কাশীরাম দাস' কবিতাগুলিই তাহার প্রমাণ। বাংলার জনমানসের সঙ্গে কীর্তিবাসের যে কি সম্পর্ক, তাহা তিনি এইভাবে অনুভব করিয়াছেন—

কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে;
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি!

কাশীরাম দাসের নিকটও বাঙ্গালীর ঋণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

নারিবে শুধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি!
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।

এইভাবে মধুসূদনের সর্বশেষ কাব্য রচনা বাঙ্গালীর চিন্তায়, বাঙ্গালীর ধ্যানে, বাংলার কথায় ও বাংলার চিত্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

৫

নিসর্গ চেতনা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা কাল হইতেই ইংরেজী রোমান্টিক কবিদিগের অনুকরণে বাংলা কাব্যেও যে রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে নিসর্গ বা প্রকৃতি একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈষ্ণব কবিতায় প্রকৃতির রূপ কবির অন্তরে আশ্রয়লাভ করিবার পরিবর্তে কেবল মাত্র বাহির হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেইজন্যই একদিক দিয়া তাহা যেমন গতানুগতিক, তেমনই অন্যদিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিয়াছিল। কবিচিত্তের স্পর্শ লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়া কেবলমাত্র কবির বহির্মুখী দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া তাহা অধিক কাল নিজের প্রাণশক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিল না। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত আসিয়া বাঙ্গালী কবির প্রকৃতিবোধ একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গেল। তারপর একশত বৎসর ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যে যখন নূতন চেতনার সঞ্চার হইল, তখন আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে তাহার পুনর্বিকাশ দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াও ইহার বহিরঙ্গরূপের মধ্যেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদের মত অন্তরের আলোকে তাহা উদ্ভাসিত করিয়া লইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার মধ্যে প্রকৃতির বহির্মুখী বর্ণনার যে খুঁটিনাটি পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তর্মুখী ভাব-বিশ্লেষণের সেই সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম প্রকৃতির মধ্যে রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়াছেন—এই বিষয়ে বিহারীলালই হউন, কিংবা রবীন্দ্রনাথই হউন, উভয়েই তাঁহার অনুগামী।

মধুসূদন রোমান্টিকধর্মী কবি ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রকৃতি-সচেতনতা তাঁহার সকল কাব্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও,

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র পূর্ববর্তী রচনা সমূহে তাহার স্বাধীন বিকাশ না হইবার কতকগুলি কারণ ছিল। তাহা প্রধানত এই যে, ইহাদের সব কয়খানি ক্লাসিক বা প্রাচীন পটভূমিকার উপর রচিত— ইহাদের মধ্যে কবির বক্তিগত রস-চেতনার অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না। তথাপি মধুসূদন তাহাদের মধ্যেও অবকাশ রচনা করিয়া তাঁহার নিজস্ব প্রকৃতিবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেই এই বিষয়ে তাঁহার কবি-চিত্তের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার সুযোগ লইয়াছিলেন; সুতরাং ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিসর্গ-চেতনার সহজ এবং স্বাভাবিক পরিচয়টির সম্যক বিকাশ দেখা যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেমন প্রকৃতির বহির্মুখী বাস্তব বর্ণনা মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে, মধুসূদনের মধ্যে তাহার পরিবর্তে কবি-চিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়ার কথাই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে বস্তুটি স্পষ্ট হইয়া উঠিত, কিন্তু কবিচিত্ত অস্পষ্ট থাকিয়া যাইত। মধুসূদনের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দেখা গেল। ইহাতে কবি-চিত্তটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, বস্তুটি অস্পষ্ট রহিয়া গেল। নিসর্গকে আশ্রয় করিয়া মধুসূদন নিজের কবি-চিত্তেরই পরিচয় দিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মকথাই বলিয়াছেন। তাঁহার 'বউ কথা কও' কবিতাটির ভিতর দিয়া পাখীর রূপটি ফুটিয়া উঠিবার পরিবর্তে কবি-চিত্তটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে—

কি দুঃখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ' কাননে ?
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে
পাখারূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?
তেঁই সাধ তুমি তারে মিনতি বচনে ?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ' মনে,—
নর-নারী রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?

সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ;
শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ' কু-দায়ে
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী ;
'ক্ষম, প্রিয়ে,' এই বলি পড় গিয়া পায়ে।
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্নমতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে।

এখানে পাখীর রূপ সম্বন্ধে একটি কথাও নাই, ইহার প্রত্যক্ষ আচরণেরও কোন পরিচয় নাই, কেবল কবির মনোভাবটি প্রসারিত করিয়া তাহা কল্পনায় ইহার উপর আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। ইহা কবিরই একান্ত ব্যক্তিগত আত্মকথা, তাঁহারই নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয়। 'বউ কথা কও' পাখীটি এখানে উপস্থিত নাই, কেবলমাত্র ইহার চিন্তাটি আশ্রয় করিয়া কবির একটি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বিহারীলালের মধ্যে প্রকৃতি ধ্যানলোকে উদিত একটি অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতি রূপরসময়ী ; কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে প্রকৃতি রূপ-রস-ছায়াহীন নির্বিশেষ কবি-কল্পনা মাত্র। 'ছায়াপথ' কবিতার মধ্য দিয়াও এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে—

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে! কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ, উজ্জ্বল কোটি-মণির কিরণে ?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারাগণে—
সৌন্দর্যে ? এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি
রাণী তুমি, নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,

দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

এই কবিতার চৌদ্দটি পদের মধ্যে 'ছায়াপথে'র বর্ণনা সম্পর্কে মাত্র 'উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে' এই কয়টি কথা আছে, অন্যত্র ইহার বহির্মুখী পরিচয় সম্পর্কে আর কিছুই নাই। ইহাতে অন্যান্য আর যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহার আত্মসমীক্ষা মাত্র, ছায়াপথের রূপ কিংবা রসের উপলব্ধি নহে। ইহাকে আশ্রয় করিয়াও কবিমনের নির্বিশেষ একটি ভাব-চেতনারই বিকাশ হইয়াছে ; রূপ এবং রসকে একান্তভাবে আশ্রয় না করিবার ফলেই ইহার নির্বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, কবি তাঁহার শৈশব স্মৃতির সঙ্গে জড়িত যে ক্ষুদ্র কপোতাক্ষ নদটি সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহারও বিশেষ রূপটি তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। জীবনের সায়াহ্ণে ইহা শৈশবের একটি সুখস্বপ্নের মত—সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সুদূর প্রবাস জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ রূপটি অস্পষ্ট হইয়া গিয়া তাঁহার কবি-চিত্তে একটি স্মৃতির সুবর্ণরেখা আঁকিয়া দিয়াছে মাত্র ; ইহার সুরে জল-কল্লোলের কলধ্বনি নাই, নীরস বালুচরের অন্তহীন বেদনার হাহাকার আছে মাত্র—

সতত হে নদ, তুমি, পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে ;
শোনে মায়া-যন্ত্র ধ্বনি) কলকলে—
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র নিসর্গ বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, ইহার রচনায় তিনি প্রকৃতি বর্ণনার মহাকাব্যোচিত সংস্কার বিসর্জন দিতে পারেন নাই। তাহার ফলেই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতি-লোকের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি-চেতনা প্রধানত ক্লাসিক

বা প্রাচীন রীতি ভিত্তিক। 'সায়ংকালের তারা' নামক কবিতাটি হইতে এই বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে—

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সুকবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?
ক্ষণ-মাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ?

এমন কি, মধুসূদনের অন্যান্য রচনার মধ্যে মধ্যে যেমন নিসর্গ বিষয়ে কিছু কিছু রোমান্টিক উপমার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাহার অভাব আছে। ইহার কারণ, ইহা রচনাকালে মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য তখন তিনি ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী রচনাগুলিরই নানাভাবে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন, নূতন সৃষ্টির প্রেরণা আর অনুভব করিতে পারেন নাই। তবে মধুসূদনের নিসর্গ-চেতনার প্রধান মূল্য এই যে, এখান হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে রোমান্টিক চেতনা জন্মলাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ণতর বিকাশ পরবর্তী গীতি-কবিদের দ্বারা সম্ভব হইলেও, মধুসূদনের মধ্যেই যে তাহার যথার্থ সূচনা দেখা দিয়াছিল, এই বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না।

৬

পূর্বানুবৃত্তি

মধুসূদনের অধিকাংশ সমালোচকই এক বাক্যে এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার অস্তমিত প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি মাত্র, ইহার রচনার পূর্বেই তাঁহার মৌলিক প্রতিভার প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথা সত্য, ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতিভার নূতন সৃষ্টির কোনও আস্বাদ পাওয়া যায় না—পূর্ববর্তী বিষয় সমূহেরই ইহার মধ্যে নূতন রূপে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এমন কি, ইহাতে 'চতুর্দশপদী কবিতা'র যে নূতন মিত্রাক্ষরের রূপটি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুরেই বাঁধা। কথাটি একটু আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে দুইটি সুরই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,—একটি আত্মবিলাপের সুর, আর একটি ক্লাসিক বা প্রাচীন কাব্যের সুর; 'আত্মবিলাপে'র সুরটির যে স্বাভাবিক গীতিগুণ আছে, তাহাতেই এই শ্রেণীর কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিষয়ের মধ্যে কবির আত্মচেতনা সঞ্চারিত করিয়া আর এক শ্রেণীর কবিতা যে ইহার মধ্যে রচিত হইয়াছে, তাহাদের সুর প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র—মনে হয়, তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য' টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে ক্লাসিক বা মহাকাব্যের উপকরণগুলি একত্র সংগ্রথিত না হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়াও দেখা যায়, তাঁহার 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী'র মধ্যে নূতন কোনও কথা নাই। ইহা রচিত হইবার পূর্বেই তাঁহার 'আত্মবিলাপ' কবিতা রচিত হইয়াছিল। 'আত্মবিলাপ' কবিতায় তিনি যেমন বলিয়াছিলেন,

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না এ কি দায় ?

তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তেও একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন,

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসব, কালেব ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্য গামী রথ চক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,—
কত শত আশা লতা শুকাযে মরিল,

এইভাবে দেখা যায়, মধুসূদনেব 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া তাঁহার 'আত্মবিলাপে'র সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ধ্বনির যে শক্তি, প্রতিধ্বনিব সেই শক্তি নাই ; কাবণ, ধ্বনিই প্রতিধ্বনিব জননী ; তেমনই তাঁহার পূর্ববর্তী মৌলিক রচনা 'আত্মবিলাপে'র যে শক্তি, তাহা তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র পুনরাবৃত্তিগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সেইজন্য ভাবের আবেগ কিংবা গভীরতার দিক দিয়াই হউক, কিংবা রচনার দিক দিয়াই হউক, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এই শ্রেণীর কবিতাগুলি শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে, ইহারা তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট কোন পরিচয় দিতে পারে নাই।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র যে সকল কবিতার মধ্যে প্রাচীন বা ক্লাসিক সুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও মধুসূদনের কাব্য পাঠকের নিকট অপরিচিত কিংবা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না। কারণ, 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ-কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া তাহা নানা

ভাবেই ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করিবার উপযোগী যে সকল বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্বৃত্ত অংশ দ্বারা তিনি তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছিলেন, ইহার জন্য কোন নূতন উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তিনি যেমন দেবী কল্পনা ও দেবী ভারতীর নিকট কবিত্বশক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাহারই অনুকরণে 'কল্পনা', 'সরস্বতী', 'শ্রীপঞ্চমী' প্রভৃতি কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কেবলমাত্র এই পদ কয়টি হইতেই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'বাল্মীকি', 'কীর্তিবাস', 'কালিদাস', 'কিরাতার্জুনীয়ম্', 'রামায়ণ' ইত্যাদি কবিতা রচিত হইয়াছে—

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দুর-তীর্থ-দরশনে।
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে
অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি, সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ, ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুর ভাষী;
মুরারি-মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর; কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি,
এ' বঙ্গের অলঙ্কার।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনে যে কথা মধুসূদন অপূর্ব কবিত্ব সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সীতা' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথাও ঐ সম্পর্কে স্বীকার করিতে হয় যে,

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনের আবেদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সীতা' কবিতায় প্রকাশ পাইতে পারেনাই—এই কথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও তাঁহার অন্যান্য রচনায় মধুসূদনের যে বৈষ্ণব-প্রাণতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এই সকল কবিতার মধ্য দিয়া ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিস্তার করিয়াছে মাত্র; যেমন 'জয়দেব', 'দেব-দোল', 'ব্রজ-বৃত্তান্ত' ইত্যাদি। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র যে, 'বিজয়া-দশমী', 'আশ্বিন মাস' প্রভৃতি কবিতা মধুসূদনের বাঙ্গালীত্বের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাদের ভাব 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ইতিপূর্বেই কবিচিত্তে এইভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল—

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' তিনি লিখিয়াছেন—

যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজরাণী মেনকা সুন্দরী
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও লিখিয়াছেন—

বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়-গৃহে;

এই কথা দিয়াই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপসংহারও করিয়াছেন—

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে,
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

এই আনন্দ ও বেদনাই মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র

'আশ্বিন মাস' ও 'বিজয়া দশমী' কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন —নূতন কোন ভাব তাহাতে নাই।

এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুসূদনের নূতন কথা কিছুই নাই; বলিবারও ছিল না, কেবল মাত্র পুরাতন কথারই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রথম প্রেরণা-জাত সৃষ্টির তুলনায় পুনরাবৃত্তির মূল্য যে অনেক অল্প তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই অনুযায়ীই মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার অন্যান্য রচনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

এমন কি, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে যে নূতন কোনও ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও নহে। মিত্রাক্ষর হইলেও ইহা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুরে বাঁধা। বিশেষতঃ ইহাতেও তাঁহার অমিত্রাক্ষরেরই অনুরূপ প্রতি পদে চৌদ্দটি অক্ষর, অনিয়মিত যতি এবং বিশিষ্ট ধ্বনিগুণ অনুযায়ী সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার দেখা যায়। এমন কি, মিলের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে অনুপ্রাস অলঙ্কার ব্যবহারের সুচতুর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মিত্রাক্ষর যুক্ত রচনা হইলেও ইহার মধ্যেও সেই সংস্কার অনুযায়ী অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগের বাহুল্য দেখা যায়। রচনা কিংবা ভাব কোন দিক দিয়াই মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে তাঁহার এই বিষয়ক পূর্ববর্তী সংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই।

৭

উত্তর সাধক

মধুসূদনের অন্যান্য বিষয়ক রচনার যেমন উত্তর সাধকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'রও উত্তর সাধক আছে। বহিরঙ্গের দিক দিয়াই হইক, কিংবা অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়াই হউক, তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনেকে অনুকরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার নাটক, প্রহসন কিংবা মহাকাব্য যেমন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পরবর্তী বহু সাহিত্যশিল্পীকে তাঁহার পথে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাহা তত করিতে পারে নাই। বিহারীলাল কোনও চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন নাই, ইহার রচনা তাঁহার প্রতিভার অনুকূল ছিল না; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে মৌলিক প্রতিভার প্রেরণায় যে চতুর্দশপদ বিশিষ্ট কবিতা পরবর্তী কালে রচনা করিয়াছেন, তাহাও যেমন 'সনেট' নহে, তেমনই মধুসূদনের আঙ্গিকগত অনুকরণ হইলেও ভাবগত অনুকরণ-জাত রচনাও নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অন্যকে অনুকরণ করিবার প্রতিভাই নহে; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মধুসূদনের ভাবগত প্রভাব অনুসন্ধান করা বৃথা। বিশেষতঃ পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধুসূদন রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কাহাকেও নূতন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করিবার মত শক্তি ছিল না। ইহার বিষয়, ভাব, রচনা-গুণ ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে মধুসূদনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। ইহা 'সনেটে'র আকার লাভ করিয়াও সনেট হইতে পারে নাই, নূতন কোনও বিষয় কিংবা ভাবেরও অবতারণা ইহার মধ্যে নাই, উচ্চাঙ্গের রচনা-গুণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই, কবি-প্রতিভার বিদ্যুৎদ্দীপ্তি ইহার মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে —একদিক দিয়া আত্মবিলাপের পরিচিত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, অপরদিক দিয়া প্রাচীন কাব্য রচনার পূর্ব ব্যবহৃত উপকরণ রাশির বৈচিত্র্যহীন

ব্যবহারের মধ্য দিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাহাকেও নূতন ভাবলোকের সন্ধান দিতে পারিল না। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরই বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকাব্য রচনার যে উৎস খুলিয়া দিলেন, তাহার অমৃত নির্ঝর বাঙ্গালীর হৃদয়কে অচিরেই অভিষিক্ত করিয়া দিল।

তবে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মধুসূদন পয়ারের অনুরূপ চৌদ্দটি অক্ষর যুক্ত পদ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' আদ্যোপান্ত রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও মধুসূদনের বিদ্রোহী মনোভাবের পরিবর্তে রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে পেত্রার্কীয় আদর্শে বাংলা কবিতা রচনা করিতে গিয়াও যে বাংলার প্রচলিত পয়ারের চৌদ্দটি অক্ষরের পদের উপরই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ অনুযায়ী বাংলায় কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন; এমন কি, মধুসূদনের পরবর্তী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু মধুসূদন বাংলা পয়ারের রূপটি কোথাও পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' যে কয়টি নূতন ছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস দেখা যায়, তাহাও ভারতচন্দ্রের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং বৈদেশিক আদর্শে রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হইলেও, মধুসূদন ছন্দের বহিরঙ্গগত গঠনের দিক হইতে বাংলা কবিতার এই বিষয়ক প্রাচীন রীতিরই অনুসরণকারী।

মধুসূদনের পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন, তাহাদের অধিকাংশ মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষরের পদ দ্বারাই রচিত হইয়াছে। তথাপি মধুসূদনের যতিবিন্যাস বৈচিত্র্য ইহাদের মধ্যে নাই—ইহাদের মধ্যে পয়ারের অনুরূপ আট অক্ষর এবং ছয় অক্ষরের পর যতি পড়িয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতালী'র মধ্যে প্রতি পদে চৌদ্দটি অক্ষর থাকিলেও পয়ারের অনুরূপ আট ও ছয়

অক্ষরে যতি পড়ে নাই। মধুসূদনের যতি বিন্যাসের গুণটি রবীন্দ্রনাথ কোনদিন আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—ইহার প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধুসূদন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। সুতরাং দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ পয়ারের অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত পদ দ্বারা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিবার আদর্শটি মধুসূদনের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু মধুসূদন প্রতি পদে যতি-বিন্যাসের বৈচিত্র্য দ্বারা ইহার মধ্যে যে ধ্বনি ও সুর সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি চতুর্দশপদী পয়ার মাত্র হইয়াছে—সনেটও যেমন হয় নাই, তেমনই মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার গুণও লাভ করিতে পারে নাই। দেখা যায়, চৌদ্দ অক্ষরের পদ রচনায় রবীন্দ্রনাথেরও যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহা নহে; কারণ, 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম আর এক শ্রেণীর চতুর্দশপদী কবিতার সন্ধান দিলেন, তাহা চৌদ্দ অক্ষরের পরিবর্তে আঠার অক্ষর যুক্ত পদ লইয়া রচিত—ইহাকে কেহ কেহ মহা-পয়ার বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কয়েকজন কবি যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেন কিংবা অক্ষয়কুমার বড়াল ইঁহারা মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র আদর্শে চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত পদ দ্বারা তাহাদের 'সনেট' সমূহ রচনা করিলেও ইহার প্রায় পরবর্তী কাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে ব্যবহৃত আঠার অক্ষর যুক্ত মহাপযার ছন্দও বাংলা সনেট রচনার আদর্শ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বিশিষ্ট ব্যতিক্রমও যে ছিল, প্রমথ চৌধুরীই তাহার প্রমাণ। তাঁহার রচিত 'সনেট পঞ্চাশৎ' মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার আদর্শে পয়ারের অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের পদ লইয়াই রচিত। কিন্তু ইহা কাব্যের কেবলমাত্র বহিরঙ্গ গঠনের কথা, অন্তরঙ্গের দিক দিয়া মধুসূদন ও প্রমথ চৌধুরীতে বিপুল পার্থক্য আছে।

সুতরাং দেখা যায়, পরবর্তী চতুর্দশপদী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের যে কোন উত্তর সাধক একেবারেই নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, কবিতার বহিরঙ্গকেও যদি ইহার একটি বিশিষ্ট

পরিচয় বলিয়াই ধরা যায়, তবে মধুসূদন তাঁহার ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র মধ্যে ইহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পেত্রার্কীয় সনেটের মূল আদর্শের প্রতি যদি লক্ষ্য স্থির থাকে, তবে মহাপয়ারের পরিবর্তে যে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পদই সনেটের কাব্যভাব প্রকাশ করিবার অধিকতর উপযোগী, তাহা অতি সহজেই মনে হইবে। কারণ, চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যে যে ভাব-গাঢ়তা প্রকাশ পায়, আঠার অক্ষরের মধ্য দিয়া তাহা পাইতে পারে না। প্রমথ চৌধুরী এই কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট সনেট রচয়িতা মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষরের পদ অবলম্বন করিয়াই সনেট রচনা করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথেব কোন কোন চতুর্দশপদী কবিতাব অনুকরণে তিনি আঠার অক্ষরের পদ বা মহাপয়ার ব্যবহার কবেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেট রচনায় যে বিশিষ্ট সার্থকতা দেখা যায়, তাহাও তাঁহার চৌদ্দ অক্ষরের পদ অবলম্বন করিবার ফলেই যে বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছে, তাহাও সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতবাং বাংলা সনেটের আদর্শ রূপটি যে কি হইতে পারে, মধুসূদন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সে পথে যাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই পরবর্তী কালে এই বিষযে বিশিষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট ঃ ১

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

[১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসরণে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল]

প্রথম সর্গ : বিরহ

১। বংশী-ধ্বনি

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন !
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল ;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ ! ॥ ১ ॥

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে !
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে ?
যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি ;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে ! ॥ ২ ॥

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী !
সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ? ॥ ৩ ॥

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের ফুল ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী !

কি লজ্জা! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী?
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো সজনি?॥ ৪॥

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি;—
গগনে উদিলে শশী হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী;
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি!॥ ৫॥

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ,!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।॥ ৬॥

২। জলধর

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে!
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে!
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে!॥ ১॥

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন!
মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন!

চপলা চঞ্চলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন ! ॥ ২ ॥

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকা রব করি,
হেরি ব্রজ কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল সুন্দরী !
উড়িতেছে চাতকিনী শূন্যপথে বিহারিণী
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ-কিঙ্করী ! ॥ ৩ ॥

হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর।
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর ! ॥ ৪ ॥

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি,
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি,
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী, ॥ ৫ ॥

নাচিবে গোকুল নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী !
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর এ তব অধিনী ! ॥ ৬ ॥

অরে আশা আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী !
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ? ॥ ৭ ॥

৩। যমুনাতটে

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।

সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ? ॥ ১ ॥
তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে)
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ? ॥ ২ ॥
এস, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে !
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে ;
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে ! ॥ ৩ ॥
ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার—
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দন চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন !
আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার ? ॥ ৪
তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে !
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে ! ॥ ৫ ॥
বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে,
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী !
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি !
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে ! ॥ ৬ ॥
কি আশ্চর্য ! এত করে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি ?
এ সকল দেখে শুনে, রাধার কপাল-গুণে,

তুমিও কি ঘৃণিলা গো রাধায়, স্বজনি ?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি ? ॥ ৭ ॥

হায় রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি ?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি !
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি ! ॥ ৮ ॥

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী।
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনী,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে। ॥ ৯ ॥

হায় রে এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমনি জলে—এত জ্বালা কার ? ॥ ১০ ॥

উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবতি,
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে ধনি করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ? ॥ ১১ ॥

৪। ময়ূরী

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী !
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ? ॥ ১ ॥

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে ! ॥ ২ ॥

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ,
বিজলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর ! ॥ ৩ ॥

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে ।
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি,
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী !

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেনে লো বসিয়া তুই বিরসবদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে, সত্য বিনোদিনি ! ॥ ৫ ॥

৫ । পৃথিবী

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াময়ী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !
যবে দশানন অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে ।

তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি ! ॥ ১ ॥
হে বসুধে, রাধা বিরহিণী !
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগা জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতু কামিনি ! ॥ ২ ॥
শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বন-শোভিনী
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে !
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! ॥ ৩ ॥
আপনি তো জান গো ধরণি
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি !
অলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !
তাহার বিরহ দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি ! ॥ ৪ ॥
লোকে বলে রাধা কলঙ্কিনী !
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর, সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধু বিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণ স্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ? ॥ ৫ ॥
হে মহি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?

বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে !
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরয ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান ! ॥ ৬ ॥

৬। প্রতিধ্বনি

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আমি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে ! ॥ ১ ॥

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লযে সে রতন ,
এ সকল দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
স্বজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী ! ॥ ২ ॥

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনী !
পর্ব্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ? ॥ ৩ ॥

জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,
মোর শ্যামধনে !
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি,
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে !
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি ! ॥ ৪ ॥

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে,
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পুরিছে আজি হাহাকার রবে !
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ রজনী ! ॥ ৫ ॥

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন ;
যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে ! ॥ ৬ ॥

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে ; হাসে, হাসে, মাধব-রমণি ! ॥ ৭ ॥

৭। উষা

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি !
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার স্বজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি ! ॥ ১ ॥

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি !
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি !

কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি ! ॥ ২ ॥

হায়, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া,
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া !
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদম্বমূলে রাধা বিনোদিয়া ! ॥ ৩ ॥

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী ;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি ?
সাজাও আনিয়া তাবে রাধা বিরহিণী ! ॥ ৪ ॥

ভালে তব জ্বলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল কিরণ ,
ফণিনী নিজ কুন্তলে পরে মণি কুতূহলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন ! ॥ ৫ ॥

৮। কুসুম

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ? ॥ ১ ॥

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?

কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ? ॥ ২ ॥

হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া ! ॥ ৩ ॥

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে ?
ব্রজ সুধানিধি শোভে কি লো হাসি,
ব্রজগগনে ?
ব্রজ কুমদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে ! ॥ ৪ ॥

হায় রে যমুনে, কেনে লো ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন, বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ? ॥ ৫ ॥

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতন !
ব্রজবনমধু নিজ ব্রজ অরি,
দলি ব্রজভবন ?
কবি মধু ভণে পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদন ! ॥ ৬ ॥

৯। মলয় মারুত

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয় পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা গায়ে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত সুধায় পুরে নন্দনকানন ,
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন ! ॥ ১ ॥

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন !
ব্রজ-প্রভাকর যিনি ব্রজ আজি ত্যজি তিনি,
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন ! ॥ ২ ॥

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ,
তব তুল্য উপহার কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী !
যাও যথা পিকবধূ— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী ! ॥ ৩ ॥

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে !
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে ! ॥ ৪ ॥

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !

তরুরাজ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তায় করিয়া দলন ! ॥ ৫ ॥

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না, হেরো না দেব কুসুম যুবতী !
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন,
অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি ! ॥ ৬ ॥

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারিধারা,
ভুলো না, পবন ।
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন !
স্মরি রাধিকার দুঃখ, হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখ দুঃখী সে সুজন । ॥ ৭ ॥

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল চাঁদে হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে ;
আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে ন. .,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে । ॥ ৮ ॥

১০ । বংশীধ্বনি

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে .লা মনে ?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ? ॥ ১ ॥
বসন্ত অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়—
বাঁশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে ?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে ?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে ? ॥ ২ ॥

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী। ॥ ৩ ॥

কি জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসি—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে ! ॥ ৪ ॥

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ ব্রজের বালা ! ॥ ৫ ॥

১১। গোধুলি

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি !
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধুলি, কোথা রহিল মাধব ! ॥ ১ ॥

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী !
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?
ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে ;
কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন। ॥ ৩ ॥

হে শিশির, নিশার আসার !
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার ;
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল ! ॥ ৪ ॥

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ ;
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর ;
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মুরতি,
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি ? ৫ ॥

হে মন্দ মলয় সমীরণ,
সৌরভ ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আজি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জলে তথা কি করে চন্দন ?
যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে ! ॥ ৬ ॥

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,
কোকিলার পঞ্চস্বর বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী !
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন। ॥ ৭ ॥

১২। গোবর্দ্ধন গিরি

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমায় চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী ;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী !
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনি কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-
সুশোভিনী ? ॥ ১ ॥

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ;
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর,
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী !
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোথা মম শ্যাম গুণমণি ? মণিহারা
আমি গো ফণিনী ! ॥ ২ ॥

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রততী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রজিত—
তোমায় উত্তরী রূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত
অসীম মহিমধর তুমি, কে না তোমা পূজে
চরাচরে ? ॥ ৩ ॥

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী ;
বিহঙ্গিনী দল তব মধুর গায়িনী ;

যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী!
দিবাভাগে দিবাকর তব, দেব, ছত্রধর
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী!
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-
প্রেম-ভিখারিণী! ॥ ৪ ॥

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর
গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা
বংশীধারী? ॥ ৫ ॥

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকূল পাথারে,
কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে!
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,
শ্রীমধুসূদনে! ॥ ৬ ॥

১৩। সারিকা

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল,—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী-প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল!

কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি ! ॥ ১ ॥
নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে ;—
আজি ও পাখীর মনঃ বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে !
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন ! ॥ ২ ॥
বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী—
শুকের সুখিনী ?
বলে ছলে, ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেধো না লো সংসারে-পিঞ্জরে ! ॥ ৩ ॥
ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে—
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী—
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয় !
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি। ॥ ৪ ॥
এ ছার সংসার আজি আঁধার, স্বজনি রে—
রাধার নয়নে !
কেন তবে মিছে তাবে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী,
লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি ! ॥ ৫ ॥
ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে ?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন আভরণে ?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন ! ॥ ৬ ॥

১৪ । কৃষ্ণচূড়া

এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে   পরেছিল কুতূহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া,   লয়েছি আমি কাড়িয়া
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ? ॥ ১ ॥

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,—
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে !
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি,   কাঁদিনু আমি, স্বজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে ,   সেই জল এই দলে
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্ লো কামিনি ! ॥ ২ ॥

পাইয়া এ কুসুম রতন—শোন্ লো যুবতি,
প্রাণহরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি !
দেখিনু রূপের রাশি   মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীত ধড়া স্বর্ণরেখা,   নিকষে যেন লো লেখা
কুঞ্জশোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে ! ॥ ৩ ॥

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে—
কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ লো ললনে ?
যে ধন রাধায় দিয়া,   রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়,   কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি ? ॥ ৪ ॥

১৫ । নিকুঞ্জবনে

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে   আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন !

সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন! ॥ ১ ॥
তুমি জান কত ভাল বাসি শ্যামধনে
আমি অভাগিনী;
তুমি জান, সুভাজন হে কুঞ্জকুল রাজন,
এ দাসীরে কত ভাল বাসিতেন তিনি!
তোমার কুসুমালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশীর ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা চরণ,
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিখিনী। ॥ ২ ॥
সে কালে—জলে রে মনঃ স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন—
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি
মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন;
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন! ॥ ৩ ॥
পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্তন,—
হেরি মম শ্যাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে শিখিনী, কানন,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।

হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন। ॥ ৪ ॥

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
রাধিকারমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?
তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর !
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়া উত্তর !
মধ কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুসূদন ! ॥ ৫ ॥

১৬। সখী

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ? ॥ ১ ॥

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ? ॥ ২ ॥

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন।
যে জন অন্তরযামী সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে কয়ে বর্ণন ?

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন। ॥ ৩ ॥

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন!
বিষাদ নিশ্বাস বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ! ॥ ৪ ॥

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন!
বিরহ বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন! ॥ ৫ ॥

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন!
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন। ॥ ৬ ॥

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন!
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন? ॥ ৭ ॥

১৭। বসন্তে

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা স্বজনি?

আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব ,—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব ! ॥ ১ ॥

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পাবেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন । ॥ ২ ॥

স্বন, স্বন, স্বনে শুন, বহিছে পবন, সই
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,
বিহঙ্গমগণে ।
দুবলয় পবিমল, নহে এ, স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন !
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন । ॥ ৩ ॥

উচ্চ বীচি রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি ;
কল কল কল কলে, সুতরঙ্গ দল চলে,
যথা গুণমণি ।
সুধাকর-কররাশি সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে , চল, ত্বরা করি—
ভুলি গো বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি ! ॥ ৪ ॥

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা , গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ,
মরমরে পাতাদল ; মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে ;—

কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলরতনে ? ॥ ৫ ॥
কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি ?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি ?
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে ! ॥ ৬ ॥
কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,
চল, ত্বরা করি,
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি
দুঃখিনী দাসীরে , চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্বজনি ;—
সুধে মধু শূন্য কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ? ॥ ৭ ॥

১৮। বসন্তে

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল,
চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে ! ॥ ১ ॥
সখি রে,—
উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে !
এ বিরহ বিভাবরী কাটানু ধৈরজ ধরি
এবে লো রব কি করি ?
প্রাণ কাঁদিছে !
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে ! ॥ ২ ॥

সখি রে,—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী!

ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,

বিহঙ্গমকুলকল,

মঙ্গল ধ্বনি!

চল লো, নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, স্বজনি! ॥ ৩ ॥

সখি রে,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে!

দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে;

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে,

ভাবিয়া মনে!

কঙ্কণ কিঙ্কিণী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে। ॥ ৪ ॥

সখি রে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে!

ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু,—

দেখিব লো দশ ইন্দু

সুনখগণে!

চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে! ॥ ৫ ॥

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে!

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সুরবে জল,

চল লো বনে!

চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে! ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় সর্গ : বিহার

"মধুসূদন ব্রজাঙ্গনার জন্য 'বিহার' নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ·" ['মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত,' ১ম সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩০০, পৃ. ৩৬৩]। প্রথম সর্গের এই কয়েক পংক্তি একখানি পুস্তকের মলাটের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল।—'মধু-স্মৃতি', [১৩২০] পৃ. ২৯৯-৩০।

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধলো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥ ॥ ১ ॥

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বরগুঞ্জমালা বর-গলে।
মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া-রূপে ঝল ঝল ঝলে॥ ॥ ২ ॥

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে॥
দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,
যে সুধার লোভে, তাহা লভিবে সুন্দরি!
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে! ॥ ৩ ॥

বীরাঙ্গনা কাব্য

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ অনুসরণে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল]

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জনক জননী কর্ত্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়াপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি অতিথিসৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?
হায়, আশানদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে; ৫
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ! আশার ছলনে, ১০
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে,
কহি—'হ্যাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁব দাসীরে!
ওই দেখ ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত ১৫
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা;
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!

দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে ২০
পদযুগ, চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।

দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা,
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ, মরমরে পাতাকুল নাচি,
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি, ২৫
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।

সুধি গন্ধি ফুলপুঞ্জে,—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল সুধা?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি, ৩০
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?

কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দ কালে?
মদনের দাস মধু, মধুর অধীনে
তুমি, সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাহার বিরহে?' ৩৫

অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদু স্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে।
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। ৪০
কহি পত্রে,—'শোন্, পত্র,—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে, কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে,—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?' ৪৫
মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরুদুরু করি

শুনি যদি পদশব্দ ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে ! ৫০
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে !
ডাকি উচ্চে অলিরাজে ; কহি,—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ ! রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি !' ৫৫
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ?
  কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে,
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে, ৬০
নরেন্দ্র , যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা ! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে ? ৬৫
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি !'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে ;— ৭০
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি
বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে ;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি !' ৭৫
আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,

নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা ! এ দুজন যদি ৮০
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি ; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে !—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে ! ৮৫

আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
গন্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,— ৯০
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ?
এই কি বে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?

এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী, ৯৫
প্রাণনাথ ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃস্বসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে ,
তা না হলে, সর্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে ! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে ১০০
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে !
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান , চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে ! ১০৫
অমনি প্রসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে !
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !

কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা কারে ?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী ১১০
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ; ১১৫
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীণা-ধ্বনি ; ১২০
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি !
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণসিংহাসনে !
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে, ১২৫
মণ্ডিত অমূল্য-রত্নে ; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে !
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে ?
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে ১৩০
কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা, ১৩৫
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?

আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পুজে মর্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে ! ১৪০

চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত, শুনি, ১৪৫
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?

এ মনে যে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীম বাহুবলে , ১৫০
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম !

আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ,
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে, ১৫৫
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বল্যে
বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে !

বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে ১৬০
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন। সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না; ও সতীত্বধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকা-পাঠে কি করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন ; কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি !—
কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি, ৫
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাসী সদা
তুই, মনোদাস হস্ত, সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা ! ১০
হে স্মৃতি কুকর্মে রত দুর্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে
তোমায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !—
ভুলি ভূতপূর্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে ! ১৫
এস তবে, প্রাণসখে ; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে !
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ !—তারানাথ ? কে তোমারে দিল ২০
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে !

এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা ? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে ২৫
অন্তরিত ; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে !
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে ?
এস তবে, প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি ;
জুড়াও তারার জ্বালা ! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি ? ৩০
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী ,—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে ?

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে ৩৫
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে !—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম ৪০
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে !
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে ,
বিনাইনু যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে !
চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু ৪৫
তাহায় ! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে !
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে
হায় রে, অবোধ আমি ! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ? ৫০

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!
বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিলে, সুমতি, ৫৫
গুরুপদে; গৃহকর্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা!
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা?
কি ছার, মুরজ, বীণা, মুরলী, ডুম্বকী? ৬০
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি! নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি!
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন; অহরহঃ, বিরহ-দহনে, ৬৫
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি, ৭০
মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে ৭৫
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে?
হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বুল শয়নধামে? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে? ৮০
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে;

কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব,
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ? ৮৫
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !" ৯০
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ,—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারি দিকে
রাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি, ৯৫
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে !
কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে ১০০
ও কর-কমলে, সখা, কহিস্ তাঁহারে,—
'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে' !"
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে ১০৫
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে, ১১০
কি আর কহিব তার ? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি লিখি

ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি, ১১৫
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ,—আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে, ১২০
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—রূপের মাধুরী ?
তবে কেন,—' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্বকথা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !
তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ; ১২৫
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি। দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদযুগল, নাথ,—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি ১৩০
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী !— ১৩৫
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?
ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী. পিঞ্জর খুলিলে,
চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব কারাগারে !
এস তুমি , এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে ! ১৪০
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব জনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে, ১৪৫
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।

এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময়; কোন্ দোষে দোষী তব পদে ১৫০
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!

কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে ১৫৫
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি!

আর কি লিখিবে দাসী? সুপণ্ডিত তুমি,
ক্ষম ভ্রম, ক্ষম দোষ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল ১৬০
লেখনী? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে।

লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া শরমে!
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি! ১৬৫
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ! কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনী-মণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীব-পদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব,— ৫
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে!

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে? মুদে আঁখি, হে দেব শরমে; ১০
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী;
কাঁপে হিয়া থরথরে! না জানি কি করি;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখ-কাহিনী!
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে! ১৫

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কায় মনঃ অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন, ২০
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্ণে সুধার লহরী!

কে যে তিনি ? জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে ?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে ,
তুলিয়া কুসুম-রাশি, মালিনী যেমতি ২৫
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া ।

গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে ।—
রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে । ৩০
খনিগর্ভে ফলে মণি , মুক্তা শুক্তিধামে !
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বি সে শুভ নিশীথে ,
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা । গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ , নদ নদী কলকলকলে ৩৫
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ,
কল্লোলিলা জলপতি গভীর নিনাদে ।
নাচিলা অপ্সরা স্বর্গে , মর্ত্যে নর-নারী ।
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে ।
বৃষ্টিলা কুসুম দেব , পাইল দরিদ্র ৪০
রতন , জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন ।
পুরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে ।

জন্মাতে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহা যত্নে । মহারত্নে পাইলে যেমতি ৪৫
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে ।

আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে । বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ? ৫০
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পুতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি,
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ?

কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি, ৫৫
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে ?
আর আর কীর্তি যত বিদিত জগতে ?

যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে
রসরাজ, মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে ! ৬০
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু, যমুনা-পুলিনে !
এইরূপে কত কাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে গুণনিধি ; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত ? ৬৫
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে !

না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে ! ৭০
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে,
ত্রিভঙ্গ, সুগল-দেশে বরগুঞ্জমালা,
মধুর অধরে বাঁশী ; বাস পীত ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম ! মোক্ষ-ধাম ভবে ! ৭৫

যত বার হেরি, দেব, আকাশ-মণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে ;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে ;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পূজি ভক্তি-ভাবে !
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি— প্রাণকান্ত মম ৮০
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে !'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে !
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি !

মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি, বেণুর সুরবে ৮৫
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে!
কহি শিখীবরে,—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোরে মণ্ডে শিরঃ যার,
পুজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জটি!'—
আব পরিচয় কত দিব পদযুগে? ৯০

শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মুর্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পুজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পুজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে, ৯৫
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে!

কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি!
কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে রুক্মিণী?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে ১০০
কায় মনঃ, অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি!—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে!
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে?

আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি ১০৫
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস, বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে!'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ, কোন্ মুখ দিয়া ১১০
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা!
দীন আমি, দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে!

রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি , ১১৫
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী ,
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি ,—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে । ১২০
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে !—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে ।

কি ছলে ভুলাই মনঃ , কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে , ১২৫
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি ৷ কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে !
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে , অলিকুল গুঞ্জরে সতত , ১৩০
কুহরে কোকিল ডালে , ফোটে ফুলরাজী ।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে ।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া !
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে ! ১৩৫

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে ; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে । কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি !

যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ,
যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি ১৪০
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কহ যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি ! কি কাজ কহিয়া ?

আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি ! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,

কংসজিত ; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী, ১৪৫
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে !
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি ?
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে ;
আইস তাহার অগ্রে ! প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে ! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে, ১৯০
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণীপত্রিকা নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি ;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ ৫
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী ১০
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?

কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব শুনি, ১৫
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ? ২০
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু, ২৫
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! ৩০
কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়েসে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়েসে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?

হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি ! ৩৫
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত.—'অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম-শব্দ মুখে,—গতি অধর্মের পথে !'

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে ৪০
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চুণ কালি গালে.
খেদাও গহন বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে

এ কলঙ্ক ? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে ৪৫
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্তুল কদলী-
সদৃশ ! সে কটি, হায়, কার-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে, ৫০
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! সুধা-হীন অধর। লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে ! ৫৫
কিন্তু পূর্বকথা এবে স্মর, নরমণি !—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য করিলা, প্রভু, ধর্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ,— ৬০
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি ,—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে ! ৬৫
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি !
ধর্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় ! ৭০
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি ?

পড়ে কি হে মনে এবে পূর্বকথা যত ? ৭৫
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি ! ৮০
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ? ৮৫
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে ?—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী ৯০
ভিখারিণী বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল পতি !'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্বজনে ! ৯৫
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী। ১০০
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !' ১০৫

লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গদেহে ।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লী-বালা-দলে ।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া— ১১০
'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি ।'
থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্মের প্রতিফল ! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ? ১১৫

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
(এত যে বয়েস, তবু লজ্জাহীন-তুমি !)—
যুবরাজ পুত্র রাম ; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ ; এ সবারে লয়ে ১২০
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি !

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি ।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন ; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে । ১২৫

চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন । না থাকে যদি পাপ এ শরীরে ,
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ;
বিচার করুন ধর্ম ধর্ম রীতি-মতে ।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে কেকয়ীপত্রিকা নাম চতুর্থ সর্গ ।

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[বৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী,
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে ?
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি ?
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে, ৫
মঞ্জুকেশি ! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে !
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,
কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে ১০
তোমার আহার নিত্য ফল মুল, বলি !
সুবর্ণ মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে !
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি—
কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা ১৫
এ নব যৌবনে তুমি ? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে ?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ খেদে ? ২০
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র ; দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,

রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে।
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী ২৫
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে।
চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে, শূর। চামুণ্ডা আপনি, ৩০
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস।—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র,—অলকার ভাণ্ডার খুলিব ৩৫
তুষিতে তোমার মনঃ, নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে।
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী ৪০
রামাকুলে সে রমণী।)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে।
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব ৪৫
শয্যা তব। সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্মিত গৃহে আমার বসতি—৫০
মুক্তাময় মাঝ তার, সোপান খচিত
মরকতে, স্তম্ভে হীরা, পদ্মরাগ মণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে!
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে

দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর স্বরে ; ৫৫
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল ! শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে !
খেলে উৎস ; চলে জল কলকল কলে !
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি, ৬০
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে !
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে !
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে ;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর ! অম্লান বদনে,
এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে ৬৫
সাজি, পুজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব !
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন ; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ ; তুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী ! ৭০
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে ;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতুহলে ! ৭৫
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু ? বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি ৮০
এই স্থলে। দেখ চেয়ে ; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি, ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী !—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায় ! সূর্য্যমুখী ৮৫

চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্যের পানে !—
কি আর কহিব তার ? যত ক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী !
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি ! ৯৫
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা !
কিন্তু বৃথা কহি কথা ! পড়িও, নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে ! ৯৫
যদিও ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, ধাইও
গোদাবরী-পূর্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ,
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে !
লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে ; ১০০
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি ;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে !
যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা. রক্ষঃপুরী ১০৫
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী , লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়েস তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি ! ১১০
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি !
আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ? ১১৫
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে

বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
এই নিবেদন করে স্বর্পণখা পদে ।

শুন নিবেদন পুনঃ ! এতদুর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে, ১২০
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব-খর্ব-কারি,
তাঁহার ; অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু । কি আশ্চর্য ! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি, ১২৫
দয়ার সাগর তুমি ! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
দয়ার সাগর তুমি । কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমারি চরণে !
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ লঙ্কাধামে । ১৩০
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভ ক্ষণে,রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে । কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী ! ১৩৫
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে ।

ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে ; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা ! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে ? আসি ত্বরা করি, ১৪০
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে ।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে স্বর্পণখাপত্রিকা নামে পঞ্চম সর্গ ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশাক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, বীরবর অর্জুন বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষি-পুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে?
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে
আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে ৫
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী; সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড়-নিতম্বী সহা সহ চিত্রলেখা ১০
চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা;
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ যায় সুখে;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে! ১৫
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল-ভুজে তোমা বাধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি, নিত্য রসবতী
সুরবালা;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা? ২০
নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি,
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি
সাজান সে বনরাজী বিরাজি সে বনে
নিরন্তর; নিরন্তর গায় পাখী শাখে;

না শুখায় ফুলকুল ; মণি মুক্তা হীরা ২৫
স্বর্ণ মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত !
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
গন্ধামোদে পুরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে
কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি ! ৩০
সশরীরে স্বর্গভোগ ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে ?
ধন্য নর-কুলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব !
পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে, ৩৫
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে ! ৪০
হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম !
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ?
রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী, ৪৫
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা ! অবিরল লুটে
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত,
(কি লজ্জা !) অধর-মধু পান করে সুখে !
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে ৫০
সেই নিদারুণ বিধি ! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত ! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে ;
মুদিত এ পোঁড়া প্রাণ তোমার বিহনে ! ৫৫

সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি ? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, ৬০
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে—
জীবশূন্য, বরশূন্য, মহারণ্য যেন !
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয় ! এই জানি, এই মানি মনে। ৬৫
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি !
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে ?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে ৭০
রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে। সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা, কহিব কেমনে ?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ৭৫
পূজিতাম শিবধনুঃ ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি !) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে। ৮০
তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি !'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে , দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে ৮৫
হস্তিনা ,—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,

যাও শীঘ্র শূন্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে !'
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া। ৯০
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি ;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্রবধূ তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে !
জল-দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি, ৯৫
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি !
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে !'
আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে
জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ ১০০
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী,—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে ?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে !
প্রার্থিনু রতিতে পুজি,—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব, ১০৫
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি !'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক, পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে !
সাধিনু মাটিরে ফাটি হইতে দুখানি ! ১১০
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য ! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জ্বলিলা যেমতি
না চাহি বাঁচিতে আর ! বাঁচিব কি সাধে ? ১১৫
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্ররথী যত।'—

জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে, ১২০
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি।
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!' ১২৪
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ,—হুহুঙ্কারি রোষে,
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে, ১৩০
অম্বুরাশি-নাদ সব কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে,—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্ন কালে সে সুকথাগুলি ১৩৫
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে;
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর স্বরে,—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি
চন্দ্রমুখি! যত ক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে ১৪০
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজল এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন!—কি লিখি, হায়, না পায় দেখিতে! ১৪৫
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী!—* *
* * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া

স্মরি পূর্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, ভিতিনু, নাথ, নয়ন-আসারে! ১৫০
কে মুছিল চক্ষুঃজল? কে মুছিবে কহ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে;
কিম্বা পান করি বিষ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব ১৫৫
হেরিতে ও পদযুগ,—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে!
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে এ সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায়! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে? ১৬০
কহ ত্রিদিবের বার্তা! কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে! ১৬৫
শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে ১৭০
ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন সুমতি
ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভুলি এ বিচ্ছেদে;
অপ্সরা-বল্লভ তুমি; নর-নারী দাসী;
তা বল্যে করো না ঘৃণা—এ মিনতি পদে!
স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে, ১৭৫
কণ্ঠে, হস্তে; পরে না কি রজত চরণে?

কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম-কর্ম-রত সদা ধর্মরাজ-ঋষি;

ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে ১৮০
শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ-দ্বয় ; মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী
নির্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য যত।
কিন্তু ক্ষুন্নমনা সবে তোমার বিহনে !
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি।
পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী, ১৯০
পূর্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে ?

পাণ্ডব-কুল-ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি !
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে, নাশিবে কৌরবে !
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে,—১৯৫
এই গীত গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে !
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে !
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি !

কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি ? এই সুর-দলে ২০০
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে ! জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে।
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ কি কারণে ? ২০৫
এস ফিরি, নররত্ন ! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী ?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ ! ২১০

আর কি অধিক কব? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে!
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী; পূর্বপুণ্য-বলে ২১৫
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন! বেদ-অধ্যয়নে
সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি! ২২০
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকা নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্তপুত্রী ভানুমতী দেবী দুর্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্প দিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহা-র নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিদ্রা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে।
না পারি দেখিতে চখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে; ৫
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!

শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি, ১০
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী! ১৫
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়, পড়িয়া কাঁদি, শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী; ২০
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু!
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।
কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে!— ২৫
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে! ৩০
ধর্মশীল কর্মক্ষেত্রে ধর্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি, ৩৫
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা, ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্মনাশা-জলে? ২০

অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি ?
অম্বু-বিম্ব, নীরবৃন্দ ফুলদূর্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব ! কি আর কহিব ?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে ?
এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি, ৪৫
ক্ষত্রমণি ! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে ৫০
ভাসে লোক ; তুমি যার পরমারি, রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে !
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব ৫৫
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম
আনায়-মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে ?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি !
কেন গর্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর, ৬০
রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ;
তোমা সহ কুরুসৈন্যে দলিল একাকী
মৎস্যদেশে ; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে ?
হায়, বৃথা আশা, নাথ ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ? ৬৫
সূতপুত্র সখা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড়, ক্ষত্রবংশপতি ?
জানি আমি ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ ,
দেব-নর-ত্রাস বীর্যে দ্রোণাচার্য গুরু ।
স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে ৭০
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে !

যদিও না হয় তাহা ; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটি
একাকী এ বীরদ্বয়ে ! সৃজিলা কি, তুমি, ৭৫
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনিরে
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ?
শুন, নাথ ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি , দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে ! ৮০
রথমধ্যে কালরূপী পার্থ ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম । ইরম্মদ-তেজা
মর্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে !
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি !
গরজে বায়ুজ ধ্বজে কাল মেঘ যেন !
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া
কালাগ্নি । কি কব, দেব, কিরীটের আভা ?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড-ভালে !
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে ! পালায় চৌদিকে ৯০
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা ! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত , মিলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া !
কি কব ভীমের কথা ? মদকল-করী- ৯৫
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে !
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা ।
মার, মার শব্দ মুখে ! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা !
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে ১০০
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী ।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—

সর্ব-অন্তকারী, যিনি! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে? ১০৫
বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি;
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী ১১০
শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু! সহসা, নাথ, পুরিল সৌরভে
দশ দিশ; পূর্ণচন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক্; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে! ১১৫
চমকি চরণযুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমণ্ডলে? ১২০
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র।'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী ১২৫
ভগ্ন; শত শত শব; কেমনে বর্নিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি!
আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনু,—দাঁড়ায়ে নিকটে, ১৩০
আস্ফালিছে অসি অরি-মস্তক ছেদিতে!
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি

রথচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন ! ১৩৫
অদূরে দেখিনু হ্রদ , সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু ! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া !
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে ?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি ! ১৪০
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী !
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চ-জনে ;
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতী-পত্রিকা নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী। অভিমনু্যর নিধনানন্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি !
শুন, নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্বের কথা , ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব ! কি আশ্চর্য, দেখ—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে !
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শূরকুলে

অভিমন্যু !' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয় ! নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।

'দেখ, কুরুকুলনাথ',—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্ত রথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে !
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ; ২০
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে !'

কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা, কাঁদিয়া মুছিনু ২৫
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা ;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টংকার, প্রভু ! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ ! কোন রথী গুণ সহ কাটে ৩০
ধনু ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ ; মরিল অশ্ব ; মরিল সারথি !
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে !'—

নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী ;—'আহা ! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে !
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি ! হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী, ৪০
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে !
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'

হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা ; কাঁদিনু আমি ! সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলি পুটে, ৪৫
কহিলা সভয়ে,—'উঠ কুরুকুলপতি !
পুজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু !
ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনি
অধীর বিষম শোকে ! গরজে গম্ভীরে
হনু স্বর্ণরথচূড়ে। পড়িছে ভূতলে ৫০
খেচর ; ভূচরকুল পালাইছে দূরে !
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম ; খেলিছ কিরীটে
চপলা ; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে !
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু ; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে ! ৫৫
মুহুর্ম্মুহুঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে
কোদণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডত্রাস ! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে ;—
'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত ; ৬০
তুমি, হে বসুধা, শুন , তুমি জলনিধি ;
তুমি, স্বর্গ, শুন, তুমি, পাতাল, পাতালে ;
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে ! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি ! ৬৫
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে।'

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে। ৭০

কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ;
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি ? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে

তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে ? ৭৫
কহ শীঘ্র, নহে, দেব, মরিব তরাসে !
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি !
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে !
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে !
কাল অজাগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে ৮০
প্রাণী ? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ?
কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনি রুষিলে ?
হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে ৮৫
তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে !
নাদিল কাতরে শিবা ; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে ; শূন্যমার্গে গর্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল ! কহিলা জনকে ৯০
বিদুর,—সুমতি তাত ! 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ ! কুরুবংশ-ধ্বংসরূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা
সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে !
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল ! ৯৫
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির রাহুগ্রাসে !
বীর্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে !
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি ! ১০০
ফেলি দূরে বর্ম, চর্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে

হেরে নিজ প্রতিমূর্তি বিমল সলিলে, ১০৫
হেরে হাসি সুবদনা সুবদন যথা
দর্পণে ! কি কাজ রণে তোমার ? কি দোষে
দোষী তব ক'ছে, কহ, পঞ্চপাণ্ডু রথী ?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি, ১১০
মম হেতু, প্রাণনাথ , দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী ।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ , ভ্রাতা পাণ্ডুপতি !
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ?—আর কি কহিব ! ১১৫
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ,—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা !) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধূ ? দেখাইল তাঁরে ১২০
উরু ? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি ?
ভ্রাতার সুকীর্তি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী ।
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি ! ১২৫
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথীকুলে সিন্ধু-অধিপতি ?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে , অনেক বধেছ
রিপু , কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে ১৩০
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি ,
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জয়ী ?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ? ১৩৫

কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্ব্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর কালে ?
স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ? ১৪০
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?
ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ; মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পলায়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে ১৪৫
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে !
জানি আমি কহিতেছি আশা তব কানে—
মায়াবিনী !—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে !
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে , অশ্বত্থামা শূরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীম গদাপাণি ! ১৫০
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পাড় পদতলে ; ১৫
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !
ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে । এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব ১৬০
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম অষ্টম সর্গ ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভুল ভূতপূর্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা-অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে ৫
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে!
হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে
কাটাইনু এত কাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে ১০
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।' ১৫
বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি!
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ!
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে! ২০
সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্! জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী

উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;— ২৫
শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে,
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে !
পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে, ৩০
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে !
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ;
নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ? ৩৫
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুজে ! গহন বিপিনে
যথা সর্বভুক্ বহ্নি, দুর্বার সমরে।
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি ! ৪০
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে
পূর্ণশশী ! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি। কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শান্তমতি। ৪৫
পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব ; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে !
তরুণ যৌবন তব ;– যাও ফিরি দেশে ;—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী ! ৫০
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে ; কর রাজ্য সুখে !
পাল প্রজা ; দম রিপু ; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি ;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে ! ৫৫

বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি ; প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী !
কি কাজ অধিক কয়ে ? পূর্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্রগৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে !
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ ভবধামে ! ৬৫
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যার দেবব্রত রথী !
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী, ৭০
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জাহ্নবীপত্রিকা নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্বশী নাম ত্রোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি !—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর্‌ নাম নাটক ; বারুণী
সাজিল মেনকা ; আমি অম্ভোজা ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে, ৫

বিধুমুখি ! দেবদল এই সভাতলে ;
বসিয়া কেশব ওই ! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি !'—হাসিলা কৌতুকে ১০
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত ;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে !
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে !

শুন, নরকুলনাথ ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে, ১৫
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ শরমে ?—
কহিব সে কথা আমি তব পদযুগে !
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম ; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী ; ও চরণে রত ২০
এ মনঃ !—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি !
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি ।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে
কলেবর ; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি ২৫
সংসারের সুখে, শূর ! যদি কৃপা কর,
তাও কহ ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে
পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ?

শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে ৩০
হেমকূটে ! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা ! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে !
সহসা কাঁপিল গিরি ! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম ! ৩৫
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্মতি,

মুহূর্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে,'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে !
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে !
পাইনু চেতন যবে, দেখিনু সম্মুখে ৪০
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী মানবীর বাঞ্ছা ! উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন !
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি ; ৪৫
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল ! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে !
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে ৫০
তমোহীনা ; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া ; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে ! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বাহন জাহ্নবী ৫৫
আবার প্রসাদে, শুভে !'—আর যা কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা ! নরকুল ধন্য তবে গুণে !
এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি ৬০
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে ?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবনদায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে গাথা ;
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে, ৬৫
নররাজ ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে

তোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য হেরি ! ৭০
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা ? শুন, রাজা ! তবে রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা ! রূপগুণাধীনা ৭৫
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভাবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিনু তোমারে !
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে ! ৮০
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !
উর্বীধামে উর্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্বীশ ! রাজস্ব দাসী দি'ব রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিখিব ? ৮৫
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি ! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া !
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি ৯০
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে !
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু, ৯৫
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে !
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে

আমার কহেন—'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে ১০০
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু-চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে উর্বশী পত্রিকা নাম দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি;
হেষে অশ্ব; গর্জে গজ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য;—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে— ৫
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে! ১০
টুট কিরীটীর গর্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে! ১৫
জন্মে মৃত্যু;—বিধাতার এ বিধি জগতে।

ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু ! পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রকর্ম সাধ ভুজবলে। ২০
হায়, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে !
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে !— ২৫
কি লজ্জা ! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে ?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি ৩০
জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নৃমণি ? ৩৫
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম, অসি ?
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে, কহ,
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে ৪০
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে ৪৫
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,

এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে ! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ? ৫০
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত। ৫৫
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে।
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁব কথা, কুলাচার্য তিনি ৬০
কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আঃ মরি, কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধু। পৌরব-সরসে
নলিনী ! অলির সখী, রবির অধীনী, ৬৫
সমীরণ-প্রিয়া ! ধিক্। হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা !
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ?
জানি আমি কহে লোক রথীকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ ! বিবেচনা কর. ৭০
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিতিল ! ৭৫
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে !
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে

সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে, ৮০
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, যায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি? ৮৫
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্র কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
'কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল ৯০
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে.
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, - হে বিধাতঃ!—পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে? ৯৫
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি প্রভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি; ১০০
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে ১০৫
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?

হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে ১১০
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা, ১১৫
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে? ১২০
কেন বা জ্বলিস্, মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর, বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর, অরে মণিহারা ফণি!—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে ১২৫
নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্র-কুলবালা আমি, ক্ষত্র-কুল বধূ,
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে, ১৩০
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে! যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি! ১৩৫

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে জনাপত্রিকা নাম একাদশ সর্গ।

পরিশিষ্ট

[মধুসূদনের ইচ্ছা ছিল যে তিনি বীরাঙ্গনা কাব্য ২১ খানি পত্রিকায় সম্পূর্ণ করেন। পূর্বে মুদ্রিত ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশের পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা এখানে সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি মুদ্রিত করিয়া দিলাম।]

১। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি! তুমি, এ বারতা পেয়ে
দুতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হ'তে। পতি তুমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর! আনিতেছে দাসী
কাপড, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না করি;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে?
দেবাদেশে নরবর বরেছি তোমারে।

*　　　　*　　　　*

আর না হেরিবে কভু দেব বিভাবসু
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারু চন্দ্র; তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে।
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে সুন্দরী—
বসুন্ধরা, যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা)
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি;
নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে।

গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হায় অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে;
স্নেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে? স্মৃতিশক্তি যত দিন রবে
এ দেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

২। অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
যদুবর! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে।
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে।
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে। এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্তি হেরি শূন্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি দেব, অপূর্ব কাহিনী।

৩। যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল,
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী সাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা? মনে বেথ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি?
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

৪। নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকরবাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি,
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রত্নজালে উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে

কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই ; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায় ! . না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্বাশার রোষে।

৫। নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব হে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

[১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে এই পাঠ গৃহীত হইল]

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি, আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ,—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ,—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ,)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে,
সেই আমি, শুন, যত গৌড় চূড়ামণি !—

ইতালি, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ,—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেত্রার্কা কবি , বাক্‌দেবীর বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণ বীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র , প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥

ফরাসীর দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে ; ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে। যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা ! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ, আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে
রশ্মি মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি !
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ,—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

জয়দেব

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে !
ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে ! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী ?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি !
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে ?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
তোমায় ; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে !—
সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি ?
মিথ্যা বা কি বলে বলি ! শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি !) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিলে
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে ?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল ;
তেই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি ;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি !
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি !

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মুরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপে বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত প্রভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের রূপে পরো—তড়িত রতনে॥

বউ কথা কও

কি দুখে, হে পাখি তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তাবে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী,
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু, দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে॥

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবতী স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মুরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ,—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে !
কামের নিকুঞ্জ এই ! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে !
সরঃ ত্যজি, সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে !
সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে !

যশের মন্দির

স্বর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে!
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!"

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার স্বর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে,
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে !
দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে !
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি ?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মুর্তি সুদল কমলে ;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে !
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে !—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার !
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন !—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপণি এ নর-নগরে—
দুর্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে। হায়, সে দুর্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা সে জন না ভজে।
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি !
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে ,
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ, গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল ! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে !—
কি আনন্দ ! পূর্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে ?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব ভকতি ?

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী, পর্বতের-শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ন মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মুরতি।
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি ?

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে, আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয়; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে, আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে !
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে !

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-সুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত ? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি ! মৃদে কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ?
বিবাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে ?
কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে ?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে !

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত!

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে! কহ, হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র-মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে।

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পুজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি ;
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী !
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী ;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে ;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে !

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে ! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে !
কোথা দাসরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবী, চিরজয়ী রণে ?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে !
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে !
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে !

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন !
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি , উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে ,
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ-মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ,
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে !
যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে !

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে.
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"—অন্নদামঙ্গল

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্বে সুবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময় ! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্ এ মোর যুকতি !

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ, যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে !—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে !
মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে !—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে*
নির্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি !
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—

ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি !

* ফরাসীস্ দেশে।

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন !
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ !
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব চরাচরে !
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায়, সুমতি !
পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে !
স্বর্ণস্রোতোরূপে লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে !

কল্পনা

লও দাসে, সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পুরি বেণুরবে দেশ !—কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;

কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি !—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি !

রাশি-চক্র

রাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িয়া তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি !
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকুল জীব-কুল প্রতি !
আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ ; রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃ-পুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর।

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর ! দুরদৃষ্ট মোর. চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে

ভাগ্যবান্‌তর কবি, পুজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে।

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে !—
ফুল-কুল-বধু-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব বিবাদে,
সুধামৃত ? এ আয়াসে কি সুফল ফলে ?
কৃপণের ভাগ্য তোর ! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিকলে
বৃথা অর্থ ; বিধি বশে তোর সে দুর্গতি !
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি !

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্মিল কবে ?
কোন্ জন ? কোন্ কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?
কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে !
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে,
থাকিবে এ কীর্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে ?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।

কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে ?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে ?—
কোথা সে ? কোথা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে !

ভরসেলে্স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে ?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্য-নন্দনে
শোভিল ? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতুহলে ?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবি-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে ?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

কিরাত-আর্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে ! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন !
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি,
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন !

করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে ;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ সে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী ;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে ;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে ;—
এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে !
হে ধর্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি ?

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু ! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,

মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে ;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ,
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্বাদে ;—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে ।

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে ।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে !
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে,
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে ।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি ।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি ।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি ।

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহুর তরাসে যেন ! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি !
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,

ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে ; বিজন দেশ ; হৈল দেব-বাণী ;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে ,
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী ;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে !"

সীতা-বনবাসে

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিনি চক্ষুঃ-জলে ,—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে ।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্মে জানকীরে ? হে নাথ ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে ?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী , ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্তি, নির্মিত পাষাণে !

কত ক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী ;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে ?
হায়, অভাগিনী সীতা ! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে
দেবর ! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি !—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে !

অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার গতি!"—
মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে।

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্য, অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দুর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে!—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গি দলে!—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ? পূজে কুতূহলে

রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি ;
বাজে শাখ, মিলে ধুপ ফুল-পরিমলে !
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী !
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে , বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন ! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে !
ব্যোমকেশ-সম কায় , ধরাতল পদে,
রতন মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে ।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান , উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র । সুধিনু তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি !"

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধ শুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্যোধন, গরজিলা অরি

ভীমসেন। ধুলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল, অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে;
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা!
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে॥

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি!
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি!—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে।"

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি!

সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মুরতি,
উড়িল চৌদিকে ধুলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে,
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অস্ত্রের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে!
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে; ফুল-ধনুঃ-ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি!
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

* * * *

নহি আমি, চারু-নেত্র সৌমিত্রি কেশরী;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।

গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি !—
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে ?

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা, পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী !
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে ,—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

উর্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল-শিখরে,
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে,
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে

রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,—"
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জিছে গগনে ,
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে ,
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে।
কহিলা মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে,
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।"

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের-শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,

রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।
"মানাগ্নি নিবামু আমি আজি এ আহবে
বর্বর ;—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপেব কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কব যোড করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,
মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে !
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে,
পশিল হিড়িম্ব রক্ষঃ—রৌদ্র ভগ্নী-দোষে।
ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জ্বলে যথা থরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি ! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে

ভয়ার্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি বিকট বদনে ;—
"রক্ষঃ-কুল-কলঙ্কিনি, কোথা লো এ বনে
তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে !
মূর্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর ! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে ।"

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি !
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে ।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে ।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে !
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে ।

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে ।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল

আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল।
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিস্ময় এ মনে।
কোথায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
সাজাতে কুচূড়া তোর, হেন সুভূষণে!
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষাগ্নি যবে জ্বালাস্ দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম-পথ ভুলে!

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস সুস্বরে?

ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর ? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি !
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃষ্টে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?
কি ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে !
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে ?—
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে !

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে।
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন
পরের ! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে
মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে !) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে !
বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কূলে

সে কানন, যদপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে
মুর্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে ! আনন্দ-গীত গায় গূঢ় স্বরে !—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী ?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী ।

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে ।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে !

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior !"
HOR.

লো সুন্দরী জননীর সুন্দরীতরা দুহিতা !—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাতে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল্ল বাক্য-বনে, নব মধুমতী।

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি।

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে ;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে !
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে !—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান ? জিজ্ঞাস সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি ।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে ;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী ,
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে ;—
সে সকলে ধিক্ মান ! ওই হে উর্বশী !
সোনার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষায় জলাশয়ে ; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য ? এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ,
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সব এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি !
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে স্বর্ণ টোপরে
তোমার ; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি
হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মুরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।
হে চল রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীটরূপে কুসুম কি নাশে ?

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে.
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে !
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো'করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে !
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্তা ।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্বাদ করে !—

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল ! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি !
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে ;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি ;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে ।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব , জানি আমি বাগ্দেবীর বরে ।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র , তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন স্ববৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি ।

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি ?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে স্বর্ণ মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয় আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে ॥

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা স্বর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে !
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য ' হ।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে ॥

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সুক্ষণে !
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে ?

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে !
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মিকী আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে !
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ?

কবিবর আল্‌ফ্রেড্‌ টেনিসন্‌

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে ! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে।
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে
বাগেদবী ? অবাক্‌ কবে কল্লোল সাগরে ?
তারারূপ হেম তার সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে !
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে ! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে।
হে ভিক্‌তর, জয়ী তুমি এই নর-কুলে !
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে !
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে ;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহিঁ বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে,
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে!—
রাজাশ্রম আজি তব! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নবদ আদিত্যের রূপে! পূর্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্বরূপে, পুনঃ পূর্ব-রসে!
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরস।

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে!—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রু-বিন্দু গলে!
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক পড়ে সহসা সে বনে ;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্বতের তলে!—
নিবিল সে শিখা, যার স্বর্ণ-কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে!
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে!
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে!
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে,
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে ;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে।

ভারত-ভূমি

**"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza!"**

FILICAIA.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি!"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?
হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা? রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি!
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি!
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে স্রষ্টা, ধরা! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি

আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে ;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে !

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস। ধন্য কবি, কবি-কুল-পতি !—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভাল বাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?

নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত সুধা ; সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য ধরে কে মর্তে, আকাশে ?

বাল্মিকী

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন-ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি !
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি !

শ্রীমন্তের টোপর

——"শ্রীপতি————————————শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।" চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃ-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে,
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে

আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি! রক্ষিব, স্বজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরংক যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্মনাশা-জলে!—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!

ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার সম রূপ ধরি ?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দুতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূতকালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা, কোন্ মণি-জালে
এ দুর্লভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে স্মরি,

কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে ?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে ?—
বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই ! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে ?

*　　　　*　　　　*

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মুরতি ;
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি ! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে !
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে !—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে
লো আশা !—নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,

ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

সমাপ্তে

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি!
সুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ বলে
অল্প দিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!

পরিশিষ্ট ঃ ২

শব্দসূচী

শব্দসূচী

[প্রান্ত-লিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যার সূচক]

★